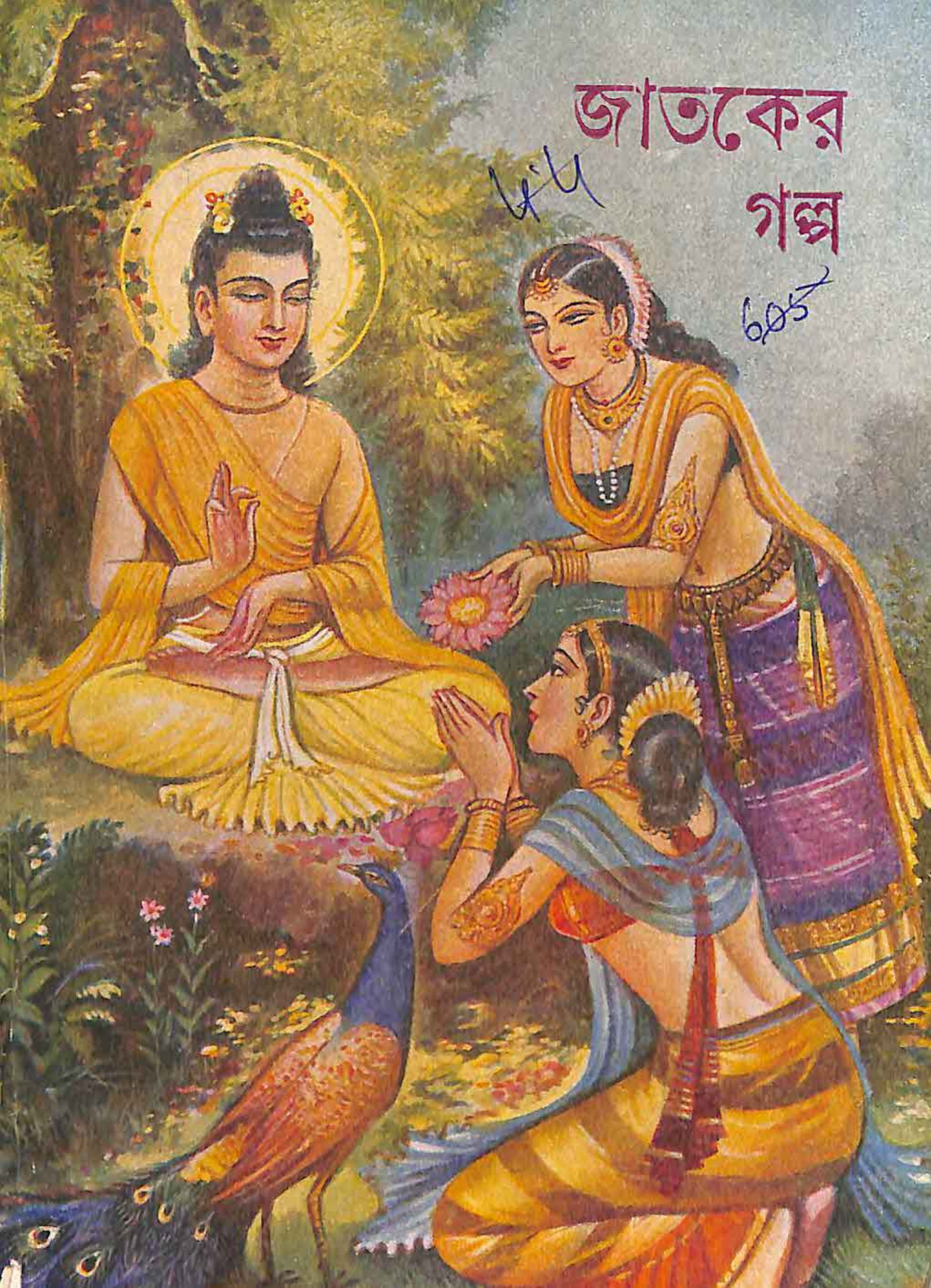
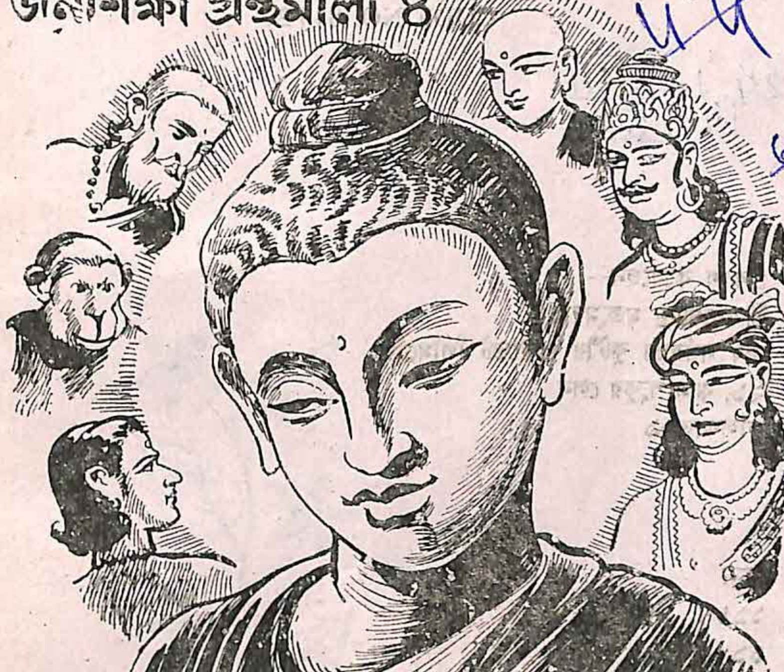
জাতকের গল্প



জনশিক্ষা গ্রন্থমালা ৪



জাতকের গল্প

উপনিষদের গল্প, পল্লী-গীতি কাব্য-কথা,

ভাগবতের গল্প প্রভৃতি প্রণেতা

সুবোধচন্দ্র মজুমদার

প্রণীত

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড

JATAKER GALPA
CODE NO. 84 J 20

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা-৯

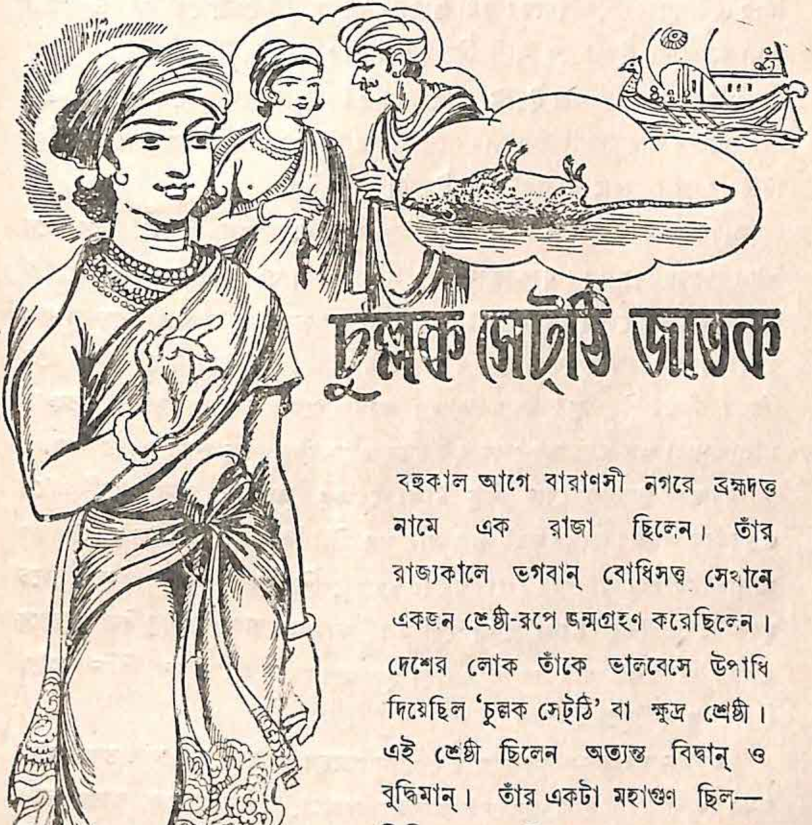
জুন
১৯৮৭
১১

ছেপেছেন—
বি· সি· মজুমদার
দেব প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা-৯

দাম—
টা. ৪·০০

উপহার

সূচী



চুল্লক সেট্‌ঠি জাতক

বহুকাল আগে বারাণসী নগরে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর রাজ্যকালে ভগবান্ বোধিসত্ত্ব সেখানে একজন শ্রেষ্ঠী-রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দেশের লোক তাঁকে ভালবেসে উপাধি দিয়েছিল 'চুল্লক সেট্‌ঠি' বা ক্ষুদ্র শ্রেষ্ঠী। এই শ্রেষ্ঠী ছিলেন অত্যন্ত বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্। তাঁর একটা মহাগুণ ছিল—তিনি কতকগুলি লক্ষণ দেখে ভালমন্দ বলতে পারতেন।

একদিন রাজপথে যেতে যেতে বোধিসত্ত্ব একটা মরা ইঁদুর দেখতে পেয়ে বললেন—যদি কোন বুদ্ধিমান ছেলে এখুনি এই মরা ইঁদুর তুলে নিয়ে যায়, তবে সে ব্যবসা ক'রে এর সাহায্যে পরিবার পালনে সমর্থ হবে।

বোধিসত্ব যখন এই কথা বলছিলেন, তখন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, ভদ্রবংশের নিঃস্ব এক যুবক। বোধিসত্বের কথা শুনে সে ভাবল, এই শ্রেষ্ঠী তো কখনও বাজে কথা বলেন না, ইঁদুরটাকে আমি নিয়েই যাই না!

এই ভেবে যুবক মরা ইঁদুরটা নিয়ে গেল। যেতে যেতে সে দেখল, এক দোকানদার তার পোষা বিড়ালের জন্যে খাবার খুঁজছে। যুবক তখন এক কড়ির বিনিময়ে দোকানদারের নিকট মরা ইঁদুরটা বেচে দিল।

যুবক ঐ কড়িটা দিয়ে কিছুটা গুড় কিনে আর এক কলসী জল নিয়ে বসে রইল পথের ধারে। যুবক জানত যে, মালাকাররা বন থেকে ফুল তুলে নিয়ে ঐ পথ দিয়ে নগরে ফেরে। ফিরবার পথে তারা খুব তৃষ্ণার্ত হ'য়ে থাকে, সে কথাও জানত যুবক। তাই সে ভাবল যে তৃষ্ণার্ত মালাকারদের গুড় আর জল খেতে দিয়ে বিনিময়ে কিছু ফুল নেবে তাদের কাছ থেকে। হলও তাই। তৃষ্ণার্ত মালাকাররা গুড় আর জল খেয়ে খুশী হ'য়ে তাকে কিছু কিছু ফুল উপহার দিল।

যুবক ঐ ফুলগুলি বেচে কিছু টাকা পেল! তা' দিয়ে আবার বেশি ক'রে গুড় কিনে আগের দিনের মতই গুড় আর জল নিয়ে পথে বসে রইল। ঐদিনও মালাকাররা গুড় আর জল খেয়ে আগের চেয়ে বেশি ফুল দিল। ঐ ফুল বেচে যুবক বেশ কিছু টাকা পেল সেদিন। তারপর আরও কিছুদিন ঐভাবে মালাকারদের গুড় আর জল খেতে দিয়ে ফুল সংগ্রহ ক'রে সেই ফুল বিক্রি ক'রে বেশ কিছু পুঁজি তৈরি করল।

একদিন খুব ঝড়-বৃষ্টিতে রাজার বাগানে গাছের ডালপালা ভেঙ্গে এত আবর্জনা জমল যে মালীরা কি উপায়ে সেই আবর্জনা সরাবে, ভেবে উঠতে পারল না। তখন ঐ যুবক পাড়ার ছেলেদের গুড় খেতে দিয়ে বশীভূত ক'রে তাদের সাহায্যে ঐ ডালপালা সরিয়ে নিয়ে এল রাস্তায়।

এদিকে নগরের এক কুমোরের ঐ দিন হাঁড়ি-কলসী পোড়ানোর কাঠ ছিল

না। কাঠ কিনতে বাজারে যাবার পথে সে দেখতে পেল ঐ ডালপালার স্তূপ। ষোলটি টাকা, কিছু মাটির গামলা ও পাত্র দিয়ে কুমোর ঐ ডালপালাগুলো কিনে নিল যুবকের কাছ থেকে।

এইভাবে যুবকের হাতে জমল চব্বিশটি টাকা। এই টাকা সম্বল ক'রে সে ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করল।

বারাণসীর পাঁচশো ঘেসেড়া প্রতিদিন মাঠে ঘাস কাটতে যেত। তাদের যাওয়া-আসার পথের ধারে যুবক একজালা জল নিয়ে বসে তৃষ্ণার্ত ঘেসেড়াদের জল দান করতে আরম্ভ করল।

ঘেসেড়ারা খুশী হ'য়ে বলল: 'তুমি আমাদের এত উপকার করছ ভাই, তোমাকে কি দেব বল?'

যুবক বলল: 'সে যখন দরকার হবে, তখন বলব।'

একদিন সেই যুবক তার এক বণিক্ বন্ধুর কাছে খবর পেল যে, পরদিন এক অশ্ববিক্রেতা পাঁচশ' ঘোড়া নিয়ে আসবে নগরে। ঐ খবর পেয়েই যুবক ঘেসেড়াদের কাছে গিয়ে বলল: 'ভাই সব, আজ তোমরা সবাই আমাকে এক আঁটি ক'রে ঘাস দেবে—আর আমার ঐ ঘাস বিক্রয় শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমরা কেউ ঘাস বেচবে না।'

ঘেসেড়ারা রাজী হ'য়ে প্রত্যেকেই তার বাড়ীতে এক আঁটি ক'রে ঘাস রেখে এল। পরদিন অশ্ববিক্রেতা কোথাও আর ঘাস কিনতে না পেয়ে হাজার টাকায় ঐ যুবকের কাছ থেকে সব ঘাস কিনে নিতে বাধ্য হল।

যুবকের হাতে এখন বেশ টাকা এসে গেছে! এই সময় সে তার এক বণিক্ বন্ধুর কাছে খবর পেল যে বন্দরে প্রচুর মাল নিয়ে এক জাহাজ ভিড়েছে।

খবর পেয়েই যুবক ভালো ক'রে সেজেগুজে এক ভাড়া গাড়ীতে গিয়ে হাজির

হল বন্দরে। সেখানে সেই জল-বণিকের সঙ্গে দর-দস্তুর ক'রে জাহাজের সমস্ত মাল কিনে নিল এবং বায়না স্বরূপ তার হাতের নামলেখা আংটি রেখে এল। তারপর কিছুটা দূরে এক তাঁবু খাটিয়ে বসল সেখানে। তারপর তার অনুচরদের বলে দিল যে, যদি কেউ তার সঙ্গে দেখা করতে আসে, তবে যেন পর পর তিনজন প্রতিহারী দিয়ে খবর পাঠানো হয়।

এদিকে বন্দরে প্রচুর মাল নিয়ে জাহাজ এসেছে শুনে বারাণসীর বণিকেরা সবাই ছুটে এল মাল কিনবার জন্যে। কিন্তু যখন তারা শুনল যে কোন এক



এক লক্ষ টাকা নিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হল—১২ পৃষ্ঠা

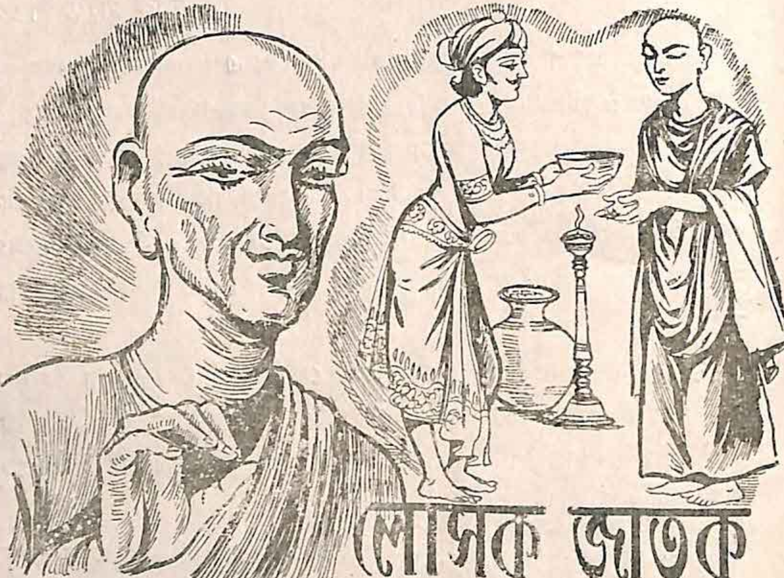
বণিক্ জাহাজের সব মাল কিনে বায়না ক'রে রেখে গেছে, তখন তারা একে একে দেখা করতে চলল ঐ যুবকের সঙ্গে। এই বণিকের সংখ্যা ছিল একশো জন।

যুবক ঐ একশো জন বণিকের সঙ্গেই কথা বলল এবং তাদের প্রত্যেককেই মালের এক-একটা অংশ ছেড়ে দিতে রাজী হল, কিন্তু শর্ত রইল যে, প্রত্যেকেই লাভের অংশস্বরূপ তাকে হাজার টাকা অগ্রিম দেবে। এইভাবে যুবক অতি অল্প সময়ের মধ্যে লাভ করল এক লক্ষ টাকা। এ ছাড়া তার নিজের অংশের মাল-গুলো বিক্রি করেও সে লাভ করল আর এক লক্ষ টাকা। এইভাবে জাহাজের মালগুলো বায়না করবার ফলে সেই যুবক দুই লক্ষ টাকা লাভ করল কয়েক দিনের মধ্যেই।

যুবকের তখন মনে পড়ল সেই চুল্লক সেট্‌ঠির কথা। সে তখন এক লক্ষ টাকা নিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হল। সে বলল: 'আপনার কথাতেই আমি আজ ধনী হ'তে পেরেছি, তাই এই এক লক্ষ টাকা এনেছি আপনাকে উপহার দিতে।'

শ্রেষ্ঠী তখন, যুবক কি উপায়ে এত অল্পদিনে এত অর্থের মালিক হয়েছে সেই কথা জানতে চাইলেন। তারপর যুবকের মুখে সমস্ত কথা শুনে তিনি এই বুদ্ধিমান্ এবং কর্মঠ যুবকের হাতেই নিজের কন্যাকে সম্প্রদান করলেন।

চুল্লক সেট্‌ঠির মৃত্যুর পর ঐ যুবকই হল বারাণসীর শ্রেষ্ঠী।



লোসক জাতক

গৌতম বুদ্ধের পূর্বে যিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন, তাঁর নাম ছিল কাশ্যপ। সেই কাশ্যপের সময়ে কোন এক গ্রামে এক সচ্চরিত্র স্থবির বাস করতেন। তাঁর এমন ক্ষমতা ছিল যে তিনি অনায়াসেই অপরের মনের ভাব বুঝতে পারতেন। তাঁর এই অলৌকিক ক্ষমতা দেখে তাঁর গ্রামের জমিদার তাঁর ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করেছিলেন।

একদিন একজন অর্হন্ (যিনি মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিলাভ করেন) ঐ গ্রামে এলেন। এর আগে এ গ্রামে আর তিনি আসেননি। গ্রামটি দেখে তিনি খুবই খুশী হলেন। জমিদারও অর্হনের সৌম্যমূর্তি এবং তাঁর চালচলন দেখে মুগ্ধ হলেন। তিনি তাঁকে যথেষ্ট সম্মান ক'রে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন।

তারপর তাঁর কাছে ধর্মকথা শুনে তিনি বললেন: 'প্রভু, এই গ্রামের প্রান্তে এক স্থবিরের * বিহার আছে। আপনি যদি দয়া ক'রে সেই বিহারে অবস্থান করেন, তাহ'লে আমি রোজ বিকালে সেখানে গিয়ে আপনার মুখে ধর্মকথা শুনে আনন্দলাভ করতে পারি।'

জমিদারের অনুরোধে অর্হন্ তখন ঐ বিহারে গিয়ে স্থবিরের সঙ্গে দেখা করলেন এবং শিষ্টাচার বিনিময়ের পর তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট কোঠায় প্রবেশ ক'রে ধ্যানমগ্ন হলেন।

বিকালবেলা পূর্ব-কথামত জমিদার ভৃত্যগণসহ গন্ধ, মাল্য ও প্রদীপ নিয়ে এলেন বিহারে। সেখানে স্থবিরকে প্রণাম ক'রে তাঁর কাছে সেই অর্হনের কথা জিজ্ঞেস করলেন। তারপর স্থবিরের নির্দেশমত জমিদার অর্হনের নিকট উপস্থিত হ'য়ে তাঁর মুখে ধর্মকথা শুনে খুব প্রীত হলেন। তারপর অর্হন্ এবং স্থবির উভয়কে পরদিন দুপুরে তাঁর গৃহে আহার করবার নিমন্ত্রণ ক'রে চলে গেলেন।

বিহারে যে স্থবির ছিলেন, তিনি ভাবলেন যে, এই অর্হন্ যদি এখানে থাকেন, তবে জমিদার তাঁরই অনুগত হ'য়ে থাকবেন, নিজের প্রাধান্য আর বজায় থাকবে না। তাঁর তখন চিন্তা হল, কি ক'রে অর্হন্‌কে এখান থেকে তাড়ানো যায়।

কিছুক্ষণ পরে অর্হন্ যখন স্থবিরের কাছে এলেন, স্থবির তখন তাঁর সঙ্গে কথা পর্যন্ত বললেন না। এ থেকেই অর্হন্ স্থবিরের মনোভাব বুঝতে পারলেন। তিনি তখন নিজের ঘরে গিয়ে ধ্যানমগ্ন হলেন।

পরদিন সকালে স্থবির আস্তে আস্তে কাঁসরে ঘা দিলেন এবং আরো আস্তে অর্হনের দরজায় টোকা দিলেন, তারপর একাই ভিক্ষাপাত্র হস্তে জমিদার-বাড়ী চলে গেলেন।

---

* স্থবির—বৃদ্ধ বৌদ্ধ ভিক্ষু।

জমিদার জিজ্ঞেস করলেন :

'সেই আগন্তুক অর্হন্ কোথায় ? তাঁকে তো নিয়ে এলেন না ?'

স্থবির বললেন, 'তিনি এখনও ঘুমিয়ে আছেন, আমি কাঁসর বাজিয়ে এবং দরজায় আঘাত ক'রেও তাঁকে জাগাতে পারিনি। সম্ভবতঃ কালকের ভূরিভোজন এখনও হজম হয়নি তাঁর।'

এদিকে অর্হন্ ঘুম থেকে উঠে স্নানাদি সমাপন ক'রে যোগবলে শূন্যপথে অন্যত্র চলে গেলেন।

জমিদার-গৃহে স্থবির প্রচুর পরমান্ন খেলেন। জমিদার এক বাটি পায়েস তাঁর হাতে দিয়ে বললেন :

'অর্হন্ বোধ হয় পথশ্রমে ক্লান্ত ব'লেই আর আসতে পারেননি, আপনি তাঁকে এই পায়েসটুকু দেবেন।'

স্থবির তখন সেই পায়েসের বাটি নিয়ে পথ চলছেন, আর ভাবছেন :

'আগন্তুক যদি একবার এ পায়েসের স্বাদ পায়, তবে লাঠি মেরেও আর তাকে তাড়ানো যাবে না। এখন এ নিয়ে কি করি—জলে ফেলে দিলে ঘি ভেসে উঠবে, মাটিতে ফেললে যত কাক এসে জমা হবে, আর সবাই ব্যাপারটা জেনে ফেলবে।'

এই ভেবে স্থবির এক পোড়া ক্ষেত দেখতে পেয়ে ঐ পরমান্ন ওখানে ঢেলে দিলেন আর তার উপর পোড়া কয়লা চাপা দিয়ে রাখলেন। তারপর বিহারে ফিরে এসে দেখলেন—অর্হন্ চলে গেছেন।

তখন তাঁর মনে হল : 'পেটের জন্যে একি পাপ করলাম আমি!'

এই অনুতাপে তিনি ভাল করে খাওয়া পর্যন্ত বন্ধ করলেন। অনাহারে তাঁর দেহ অস্থিচর্মসার হ'য়ে এল এবং শেষ পর্যন্ত অনুতাপ করতে করতে মারা গেলেন তিনি। মৃত্যুর পরও তিনি নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে লাগলেন। পাঁচ শ' বার

তিনি যক্ষরূপে এবং পাঁচ শ' বার কুকুররূপে জন্মগ্রহণ করলেন। এই হাজার জন্মের প্রত্যেকবারেই তিনি শুধু একবার ক'রে পেট পূরে খেতে পারতেন।

পরের জন্মে তিনি কাশীতে এক ভিক্ষুরের ঘরে 'মিত্রবিন্দক' নামে জন্মগ্রহণ করলেন। তাঁর অদৃষ্টের দোষে তাঁর জন্মের পর থেকেই পরিবারে নানা দুর্দশা দেখা দিল। তখন তাঁর মাতাপিতা অপয়া বলে তাঁকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

এই সময় বারাণসীতে বোধিসত্ত্ব অধ্যাপকরূপে বর্তমান ছিলেন। মিত্রবিন্দক তাঁর কাছে গিয়ে বিদ্যার্জন করতে লাগলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সহপাঠীদের সঙ্গে মারামারি ক'রে পালিয়ে চলে গেলেন এক গ্রামে। সেখানে এক দরিদ্র কন্যাকে বিয়ে করলেন—ক্রমে দুটি সন্তান হল তাঁদের।

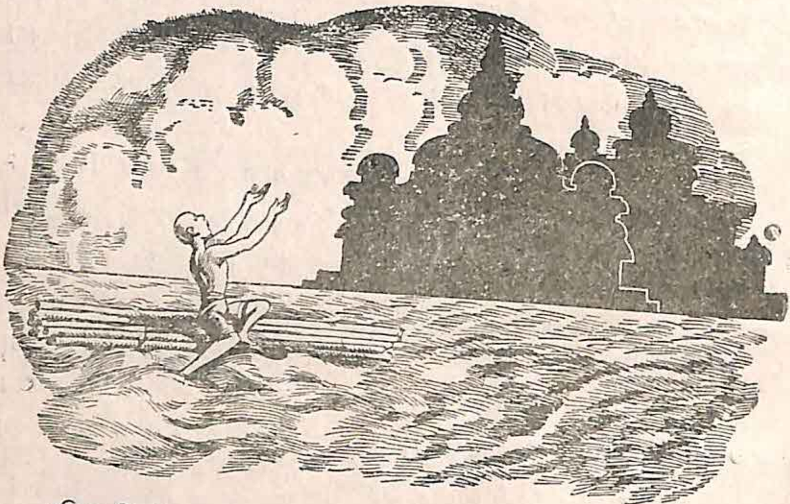
মিত্রবিন্দক লেখাপড়া জানেন দেখে গ্রামবাসীরা তাঁকে কিছু বেতনের ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে শিক্ষকতা করতে বলল। এর পরেই গ্রামে নানা অঘটন ঘটতে লাগল। রাজার কোপে গ্রামবাসীরা শাস্তি পেল, সাতবার গ্রামে অনাবৃষ্টি হল এবং সাতবার গ্রাম পুড়ে ছারখার হ'য়ে গেল।

গ্রামবাসীরা তখন বুঝতে পারল যে, মিত্রবিন্দকের পাপেই এ সমস্ত ঘটছে। তারা তখন মারতে মারতে মিত্রবিন্দককে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিল।

বেচারা মিত্রবিন্দক তখন স্ত্রীপুত্র নিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হলেন। পথে রাক্ষসেরা তাঁর স্ত্রীপুত্রকে নিয়ে গেল, মিত্রবিন্দক কোনরকমে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালেন। স্ত্রীপুত্রহারা হ'য়ে অবশেষে তিনি এক বন্দরে গিয়ে হাজির হলেন।

ঐ বন্দর থেকে এক জাহাজ ছাড়ছে দেখে মিত্রবিন্দক সেই জাহাজে চাকরি নিলেন। সমুদ্রের বুকে জাহাজ চলেছে—সাতদিন পর হঠাৎ জাহাজ থেমে গেল, আর চলে না। কার পাপে জাহাজ অচল হয়েছে গণনা করবার জন্যে জাহাজের কর্মচারীরা সাত-সাতবার ঘুঁটি ফেলল, আর সাতবারই দেখা গেল

মিত্রবিন্দকের নাম উঠেছে। তখন তারা মিত্রবিন্দকের হাতে এক আঁটি বাঁশ দিয়ে তাঁকে সমুদ্রে ফেলে দিল। জাহাজ আবার চলতে লাগল।



এদিকে মিত্রবিন্দক বাঁশের আঁটিতে চড়ে ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে চলছেন। তাঁর স্থবির জন্মে তিনি যে পুণ্য অর্জন করেছিলেন, তারই বলে তিনি এক স্ফটিক-বিমানে চারজন দেবকন্যাকে দেখতে পেলেন। সেই দেবকন্যাদের দয়ায় কিছু পথ নির্বিঘ্নে চলবার পর এক রূপার তৈরী বিমানের কাছে গিয়ে হাজির হলেন—তাতে ছিলেন আটজন দেবকন্যা। তারপর সেই বিমান ছাড়িয়ে আরো কতদূর গিয়ে দেখতে পেলেন মণিময় এক বিমানে ষোলজন দেবকন্যা, এবং পরে এক সোনার বিমানে বত্রিশজন দেবকন্যা। মিত্রবিন্দক তাঁদের কারো কথা না শুনে আরো এগিয়ে চললেন। এগুতে এগুতে শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছুলেন এক যক্ষপুরীতে। সেখানে এক যক্ষী ছাগীর বেশ ধ'রে বেড়াচ্ছিল। মিত্রবিন্দক

মাংসের লোভে সেই ছাগীর পা চেপে ধরলেন। যক্ষী তাঁকে এমন জোরে ছুঁড়ে দিল যে মিত্রবিন্দক ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়লেন বারাণসীর প্রান্তে এক খালের পারে।

ঐ খালের কাছেই রাজবাড়ীর সমস্ত ছাগল চ'রে বেড়াত। ক'দিন ধরেই রাজার ছাগল চুরি যাচ্ছে—এ কারণে কয়জন প্রহরী দূর থেকে ছাগলের উপর লক্ষ্য রাখছিল।

মিত্রবিন্দক ভাবল :

এক ছাগীর পা ধরে এখানে এসে পড়েছি, দেখি এদের একটার পা ধরলে আবার দেবকন্যাদের কাছে যাওয়া যায় কিনা !

এই ভেবে মিত্রবিন্দক যেমন একটা ছাগীর পা ধরেছেন, অমনি ছাগী চেঁচিয়ে উঠল। সে চীৎকার শুনে প্রহরীরা দৌড়ে এসে মিত্রবিন্দককে ধরে মারতে মারতে নিয়ে চলল রাজার কাছে।

এমন সময় বোধিসত্ত্ব পাঁচশত শিষ্য নিয়ে চলছিলেন স্নানের উদ্দেশ্যে ; প্রহরীদের হাতে মিত্রবিন্দককে দেখতে পেয়ে তিনি চিনতে পারলেন। প্রহরীদের ব'লে ক'য়ে তিনি তাঁকে মুক্ত ক'রে নিজের কাছে নিয়ে এলেন। তারপর তাঁর কাছ থেকে সব কথা শুনে বোধিসত্ত্ব বললেন : 'মন থেকে হিংসা দূর করতে না পেরেই তোমার এই দুর্দশা !'

এই স্থবিরের নাম ছিল লোসক। সেজন্যে এই কাহিনীর নাম হয়েছে লোসক জাতক।

ক্ষান্তি জাতক



অনেকদিন আগে বারাণসীতে কলাবু নামে এক রাজা ছিলেন। এই কলাবুর রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব এক বিরাট বিত্তশালী ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। সে জন্মে তাঁর নাম ছিল কুণ্ডলকুমার। তক্ষশিলায় পড়াশোনা শেষ ক'রে কুণ্ডল-কুমার সর্ববিদ্যাবিশারদ হ'য়ে উঠলেন। তারপর গৃহধর্ম অবলম্বন করলেন। ইতিমধ্যে তাঁর মাতাপিতার মৃত্যু হল। তখন কুণ্ডলকুমার তাঁর পিতার বিরাট ধনরাশির দিকে তাকিয়ে ভাবলেন: আমার বাবার যে এত টাকাকড়ি কিন্তু

তার কিছুই তো তিনি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেননি! আবার উত্তরাধিকারসূত্রে আজ আমি সমস্ত অর্থের মালিক হয়েছি, কিন্তু আমাকেও তো সব ফেলে রেখে যেতে হবে!

এই ভেবে কুণ্ডলকুমার দান করতে আরম্ভ করলেন। দান করতে করতে তিনি সমস্ত অর্থ নিঃশেষ ক'রে সন্ন্যাসী হ'য়ে হিমালয়ে চ'লে গেলেন। হিমালয়ে গিয়ে ফলমূল আহার ক'রে ভগবানের চিন্তা ক'রে দিন কাটাতে লাগলেন তিনি।

দীর্ঘকাল ফলমূল খেয়ে হিমালয়ে বাস করবার পর কুণ্ডলকুমারের ইচ্ছা হল লবণ ও অম্ল খেয়ে মুখের রুচি ফেরাবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি নেমে এসে বারাণসীর রাজোদ্যানে প্রবেশ করলেন। একদিন ভিক্ষাপাত্র হস্তে কুণ্ডল-কুমার রাজ-সেনাপতির গৃহদ্বারে উপস্থিত হ'লে সেনাপতি তাঁকে সসম্মানে ঘরে নিয়ে গেলেন এবং পরিতৃপ্তি-সহকারে ভোজন করালেন। আহার শেষ হ'লে তিনি কুণ্ডলকুমারকে রাজোদ্যানে বাস করবার জন্যে বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন। তাঁর অনুরোধ এড়াতে না পেরে কুণ্ডলকুমার রাজোদ্যানেই বাস করতে লাগলেন।

একদিন রাজা কলাবু সুরাপানে মত্তপ্রায় হ'য়ে নর্তকীদলসহ উদ্যানে প্রবেশ করলেন—সেখানে তাঁর জন্যে সুকোমল শয্যা রচিত হল। কলাবু এক নর্তকীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন। অন্য নর্তকীরা তখন গান-বাজনা ও নাচে তাঁর তুষ্টি বিধান করতে লাগল। ক্রমে রাজা ঘুমিয়ে পড়লেন।

তখন নর্তকীরা ভাবল: যার জন্যে এই নৃত্যগীত, তিনিই যখন ঘুমিয়ে পড়েছেন, তখন আর এর প্রয়োজন কি?

এই ভেবে তারা নাচ-গান বন্ধ ক'রে উদ্যানে ঘুরতে লাগল। এক সময়ে তারা দেখতে পেল দেবতুল্য উজ্জ্বল এক সন্ন্যাসী ব'সে আছেন।

তারা সকলে মিলে তখন গেল সেই সন্ন্যাসী কুণ্ডলকুমারের কাছে। তারপর তাঁকে প্রণাম ক'রে সকলে বলল: 'প্রভু! আমাদের কিছু ধর্মোপদেশ দিন।'

কুণ্ডলকুমার ধীরে ধীরে তাদের ধর্ম-কথা শোনাতে লাগলেন।

এদিকে রাজা কলাবু হঠাৎ জেগে উঠলেন। তারপর নর্তকীদের কাউকে দেখতে না পেয়ে ক্রুদ্ধ হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন:

'ওরা সব কোথায় গেল?'

যে নর্তকীর কোলে মাথা রেখে তিনি শুয়েছিলেন সে বলল: 'ওরা সব তপস্বীকে ঘিরে ব'সে আছে।'

এই কথায় রাজার ক্রোধ আরও বেড়ে গেল। তিনি ভাবলেন: কুণ্ডল-কুমার নিশ্চয়ই একজন ভণ্ড সন্ন্যাসী। তাই তিনি খড়্গ হাতে নিয়ে ছুটলেন তাঁকে শিক্ষা দিতে। নর্তকীদের মধ্যে যারা রাজার প্রিয়পাত্রী ছিল, তারা এগিয়ে এসে রাজার হাত থেকে খড়্গ কেড়ে নিল। রাজার ক্রোধও কিছুটা শান্ত হল।

তখন তিনি কুণ্ডলকুমারকে জিজ্ঞেস করলেন: 'শ্রমণ, তুমি কোন্ মতাবলম্বী?'

কুণ্ডলকুমার উত্তর দিলেন: 'আমি ক্ষান্তিবাদী।'

রাজা জিজ্ঞেস করলেন: 'ক্ষান্তি কাকে বলে?'

সন্ন্যাসী বললেন: 'লোকে গালি দিলে, প্রহার করলে কিংবা মনে কষ্ট দিলেও মনে যখন ক্রোধ জন্মে না, তখন সেই মনোভাবকে বলে ক্ষান্তি।'

রাজা তখন কুণ্ডলকুমারের ক্ষান্তি পরীক্ষা করবার উদ্দেশ্যে জল্লাদকে ডাকলেন। জল্লাদ একহাতে কুঠার আর একহাতে কাঁটাওয়ালা ছড়ি নিয়ে এসে রাজাকে প্রণাম করল। রাজা বললেন: 'এই লোকটা ভণ্ড ও চোর। একে টেনে মাটিতে ফেলে কাঁটাওয়ালা ছড়ি দিয়ে দুই হাজার বেত্রাঘাত কর।'

জল্লাদ তাই করল। কুণ্ডলকুমারের চামড়া ছিঁড়ল, মাংস ছিঁড়ল, সর্বদেহে রক্তের স্রোত বয়ে গেল। কিন্তু সন্ন্যাসী শান্ত নির্বিকার!

রাজা জিজ্ঞেস করলেন: 'এখন বলত তপস্বী, তুমি কোন্ বাদী?'

কুণ্ডলকুমার উত্তর দিলেন: 'আমি ক্ষান্তিবাদী। মহারাজ! আপনি ভেবেছেন, আমার চামড়ার নীচে বুঝি ক্ষান্তি আছে, তাই চামড়া কেটেছেন।



'এই লোকটা ভণ্ড ও চোর।'—১৪ পৃষ্ঠা

কিন্তু ক্ষান্তি আমার চামড়ার নীচে নয়, সে আমার হৃদয়ে আছে—আপনি তার নাগাল পাবেন না।'

তারপর রাজার আদেশে ক্রমে ক্রমে সন্ন্যাসীর হাত, পা, নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করা হল এবং প্রত্যেকবারই জিজ্ঞেস করা হল তিনি কোন্ বাদী? সন্ন্যাসী প্রতিবারই উত্তর দিলেন যে তিনি ক্ষান্তিবাদী। ক্ষান্তি আছে তাঁর হৃদয়ে, মহারাজ কোন অবস্থাতেই তার নাগাল পাবেন না। রাজা যখন আর কোন প্রকারেই কুণ্ডলকুমারকে নোয়াতে পারলেন না, তখন সন্ন্যাসীর বক্ষে পদাঘাত ক'রে চ'লে গেলেন।

রাজা চ'লে গেলে পর সেনাপতি বোধিসত্ত্বের শরীরের রক্ত মুছে দিয়ে হাতে, পায়ে, নাকে ও কানে পট্টি বেঁধে দিলেন, তারপর সন্ন্যাসীকে প্রণাম ক'রে বললেন:

'রাজা আপনার প্রতি অত্যাচার করেছেন। তার জন্যে যদি কারো উপর ক্রুদ্ধ হন, তবে যেন রাজার উপরই হন—অন্য কারো উপর নয়। আপনার ক্রোধে যেন রাজ্যের বিনাশ না হয়।'

সেনাপতির কথা শুনে কুণ্ডলকুমাররূপী বোধিসত্ত্ব বললেন:

'যিনি আমাকে পীড়ন করেছেন, তিনি চিরজীবী হ'য়ে থাকুন। আমার পক্ষে ক্রোধ করা কখনও সম্ভব নয়।'

সহসা পৃথিবী ফেটে দু'ভাগ হয়ে গেল। ভেতর থেকে আগুন বেরিয়ে এসে রাজাকে ঘিরে ফেলল। রাজা সেই ভূগর্ভে প'ড়ে মহা নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে লাগলেন।

কুণ্ডলকুমারও সেই দিনই দেহত্যাগ করলেন। রাজপুরুষেরা আর নাগরিকগণ যথাবিধানে তাঁর পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করলেন।



ব্রহ্মদত্ত যেকালে বারাণসীতে রাজত্ব করতেন, সেকালে কোন গ্রামে 'বেদব্ভ'-জ্ঞাতা এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই 'বেদব্ভ' মন্ত্রের এমনই গুণ ছিল যে, তিথি-নক্ষত্রের যোগে যদি আকাশের দিকে তাকিয়ে এই মন্ত্র উচ্চারণ করা যেত, তবে আকাশ থেকে একসঙ্গে সোনা, রূপা, মুক্তা, মণি, বৈদূর্য, হীরক এবং প্রবাল—এই সপ্তরত্ন ঝর ঝর ক'রে পড়তে থাকত। বোধিসত্ত্ব এই কথা শুনে সেই 'বেদব্ভ'-মন্ত্র-জানা ব্রাহ্মণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

একদিন ঐ ব্রাহ্মণ বোধিসত্ত্বকে সঙ্গে নিয়ে চেতিয়রাজ্যের দিকে যাচ্ছিলেন। পথের মধ্যে 'প্রেষণক' নামে দস্যুদল তাঁদের বন্দী করল। প্রেষণক দস্যুদলের নিয়ম ছিল, তারা দু'জনকে ধরলে একজনকে আটকে রেখে অপর জনকে পাঠাত মুক্তি-মূল্য নিয়ে আসবার জন্যে। ঐ ব্রাহ্মণ আর বোধিসত্ত্বকে ধরে প্রেষণক দস্যুরা ব্রাহ্মণকে আটকে রাখল আর বোধিসত্ত্বকে পাঠাল মুক্তি-মূল্য আনবার জন্যে।

বোধিসত্ত্ব দু' একদিনের মধ্যেই অর্থ নিয়ে ফিরে আসবেন, গুরুকে এই আশ্বাস দিয়ে গৃহে ফিরে চললেন। কিন্তু যাবার সময় ব্রাহ্মণকে বারবার বলে গেলেন:

'প্রভু! আজ রত্ন-বর্ষণের যোগ আছে—কিন্তু সাবধান, ভুলেও যেন লোভে প'ড়ে রত্ন-বর্ষণ না ঘটান, যদি রত্ন-বর্ষণ ঘটান, তাহ'লে কিন্তু আপনি এবং দস্যু-দলের কেউ জীবিত থাকবেন না।'

এই বলে বোধিসত্ত্ব চলে গেলেন আর ব্রাহ্মণ দস্যুদলের হাতে বন্দী হ'য়ে রইলেন।

এদিকে সন্ধ্যাকালে আকাশে যখন পূর্ণচন্দ্রের উদয় হল, তখন ব্রাহ্মণ ভাবলেন, আজ যখন রত্ন-বর্ষণ যোগ আছে, তখন রত্ন-বর্ষণ ঘটিয়েই তো দস্যুদলের হাত থেকে মুক্তি পেতে পারি—অনর্থক বন্দীদশা ভোগ করি কেন?

এই ভেবে তিনি দস্যুদের বললেন: 'তোমরা যখন অর্থের জন্যেই আমাকে বন্দী ক'রে রেখেছ, তখন তোমাদের ইচ্ছামত ধনরত্ন তোমাদের পাইয়ে দিচ্ছি, তোমরা আমার বাঁধন খুলে দিয়ে স্নান করাও, নতুন কাপড় পরিয়ে দাও আর কিছুক্ষণের জন্যে নির্জন স্থানে থাকতে দাও।'

ব্রাহ্মণের কথায় দস্যুরা সম্মত হয়ে তাঁর কথামত কাজ করল। তখন ব্রাহ্মণ 'বেদত্ত'-মন্ত্রের সাহায্যে আকাশ থেকে প্রচুর রত্ন-বর্ষণ করলেন। দস্যুরা চাদরে রত্নের পোঁটলা বেঁধে রওনা হল—ব্রাহ্মণও তাদের পিছু পিছু চললেন।

এমন সময় অপর এক দস্যুদল প্রেষণকদের আক্রমণ ক'রে রত্ন সব দাবি করলে।

প্রেষণকরা তখন ব্রাহ্মণকে দেখিয়ে বলল: 'ধন চাও তো ঐ ব্রাহ্মণকে ধর। উনি আকাশের দিকে তাকিয়ে মন্ত্রপাঠ করলেই আকাশ থেকে রত্ন-বর্ষণ হয়।'

তখন দ্বিতীয় দস্যুদল ব্রাহ্মণকে ধরে বলল: 'আমাদের রত্ন দাও।'

ব্রাহ্মণ বললেন : 'আর এক বৎসর পর রত্ন-বর্ষণ যোগ আসবে, ততদিন অপেক্ষা না করলে তো তোমাদের কিছু দিতে পারব না।'

কিন্তু তারা সে কথা মানল না। ভাবল : ব্রাহ্মণ বুঝি চাতুরী করছেন। তখনই তারা ব্রাহ্মণকে কেটে ফেলল, তারপর প্রেষণকদেরও মেরে কেটে তাদের সমস্ত রত্ন নিয়ে নিল।



প্রথম দস্যু অতর্কিতে তাকে আক্রমণ ক'রে হত্যা করল—২০ পৃষ্ঠা

কিন্তু ব্যাপার এখানেই মিটল না। ধনের ভাগাভাগি নিয়ে দ্বিতীয় দস্যুদলের নিজেদের মধ্যেও মারামারি লেগে গেল। তারা পাঁচ শ' জন দুই দলে বিভক্ত হ'য়ে কাটাকাটি করতে লাগল। দু'জন বাদে ওরা পাঁচ শ' দস্যুও নিহত হ'ল।

তখন অবশিষ্ট দুইজন সমস্ত ধন দখল ক'রে নিকটবর্তী এক গ্রামে লুকিয়ে রাখল। তাদের একজন ধন রক্ষা করতে লাগল, আর অপরজন গ্রামে গেল খাবার আনতে।

যে ধন রক্ষা করছিল, বসে বসে সে ভাবল :

যদি অপর দস্যুকে হত্যা ক'রে ফেলি, তাহ'লে তো একলাই সমস্ত ধন ভোগ করতে পারব।

এই ভেবে সে তলোয়ার হাতে ক'রে দ্বিতীয় জনের অপেক্ষা করতে লাগল।

এদিকে দ্বিতীয় জন খাবার আনতে গিয়ে ভাবল :

যদি অপরজনের খাদ্যে বিষ মিশিয়ে দিয়ে হত্যা করি, তাহ'লে তো আমি একাই সমস্ত ধন ভোগ করতে পারি।

এই ভেবে সে নিজের অংশ খেয়ে বাকী অংশে বিষ মিশিয়ে নিয়ে গেল। সে খাবার নিয়ে যেতেই প্রথম দস্যু অতর্কিতে তাকে আক্রমণ ক'রে হত্যা করল—তারপর বিষমাখা খাবার খেয়ে সেও প্রাণত্যাগ করল।

এইভাবে ব্রাহ্মণ, পাঁচশত প্রেষণক এবং অপর পাঁচশত দস্যুও নিহত হল।

বোধিসত্ত্ব তাঁর কথামত অর্থ নিয়ে ফিরে এসে দেখলেন—ধন-রত্ন ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়ে আছে। তখনই তিনি ব্যাপার বুঝতে পারলেন। তারপর ব্রাহ্মণের দেহ কুড়িয়ে এনে তার সৎকার করলেন, প্রেতপূজা করলেন। পরে বাকী এক হাজার দস্যুর শব দেখতে পেয়ে বললেন : 'অন্যায় ভাবে যারা নিজের সুবিধা করতে চায়, তারা নিজেদেরও সর্বনাশ করে, অপরেরও সর্বনাশ করে।'

বোধিসত্ত্ব সমস্ত রত্ন নিজের গৃহে নিয়ে গেলেন, তারপর সেই সমস্ত ধন দান ক'রে এবং বহুবিধ সৎকার্যে পুণ্যার্জন ক'রে যথাকালে মৃত্যুর পর স্বর্গধামে চলে গেলেন।

কটাহক-জাতক



পুরাকালে ব্রহ্মদত্ত যখন বারাণসীতে রাজত্ব করতেন, তখন বোধিসত্ত্ব ছিলেন সেখানকার একজন শ্রেষ্ঠী। যেদিন বোধিসত্ত্বের স্ত্রী পুত্র প্রসব করলেন, সেদিন তাঁদের এক দাসীরও পুত্র হল। দু'টি সন্তানই একসঙ্গে থাকে, খেলাধূলা করে—একসঙ্গেই বড় হয়।

বোধিসত্ত্বের পুত্র যখন পাঠশালায় পড়তে যায়, তখন দাসীর পুত্রও তার সঙ্গে সঙ্গে যায় কাঠের তক্তা নিয়ে। সেখানে গিয়ে দাসীর পুত্রও লিখতে পড়তে শিখল। কালক্রমে সে একজন মহা চতুর ব্যক্তি হ'য়ে উঠল! দেখতে শুনতেও সে বেশ ভালই ছিল। দাসীর এই পুত্রের নাম হল কটাহক।

কটাহক বড় হ'লে সে শ্রেষ্ঠীপুত্রের ভাণ্ডারী নিযুক্ত হল। কিন্তু মনে তার সুখ নেই, সে ভাবল, এখানে থাকলে ভাণ্ডারী হ'য়েই সারাজীবন কাটাতে হ'বে আর আমার একটু দোষ দেখলেই প্রভু মারধর করবেন, নয়তো কারাগারে নিয়ে বন্দী ক'রে রাখবেন। কাজেই সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবার ব্যবস্থা এখন থেকেই করতে হয়।

এই ভেবে সে এক জাল পত্র লিখল। নগর থেকে একটু দূরে বোধিসত্ত্বের এক শ্রেষ্ঠী বন্ধু থাকতেন। তাঁর বিবাহযোগ্যা এক কন্যা ছিল। একদিন কটাহক এক চিঠি নিয়ে সেই শ্রেষ্ঠীর কাছে গেল। সেই চিঠিতে লেখা ছিল :

"আমার পুত্রকে আপনার নিকট পাঠাচ্ছি। আমার ইচ্ছা, আপনার সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করি। আপনার কন্যাকে আমার এই পুত্রের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে আপনার নিকট কিছুকাল কন্যা-জামাতাকে রেখে দিলে আমি খুশী হব। যথাসময়ে আমি তাদের নিজের বাড়িতে নিয়ে আসব।"

সে চিঠির নিচে বোধিসত্ত্বের নাম লেখা ছিল। বলা বাহুল্য—এই চিঠি ছিল কটাহকের নিজেরই লেখা। কিন্তু শ্রেষ্ঠী তো আর অতশত জানেন না! তিনি সুন্দর এবং চতুর কটাহককেই বন্ধু বোধিসত্ত্বের পুত্র বলে ধরে নিলেন এবং মহা আনন্দে তার সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিলেন। বিস্তর দাসদাসী নিয়ে কটাহক পত্নীসহ শ্বশুরবাড়িতে বাস করতে লাগল।

খুব আনন্দে দিন কাটাচ্ছে কটাহক। তার চালচলনে কোন দোষত্রুটি কেউ দেখতে পায় না। শুধু এক বিষয়ে তার খুঁতখুঁতি—কোনরকম রান্নাই কটাহকের পছন্দ হয় না। সে বলত : 'নগরের বাইরে যারা থাকে, তারা কি রাঁধতে পারে? না, ভাল পোশাক-পরিচ্ছদের মর্যাদা বুঝে?'

তার কথা শুনে সবাই চুপ ক'রে থাকে।

এদিকে বোধিসত্ত্ব ক'দিন ধরে কটাহককে দেখতে না পেয়ে তার খোঁজ করবার জন্যে লোক লাগালেন। একজন এসে সন্ধান দিলে যে সে শ্রেষ্ঠীর মেয়েকে বিয়ে ক'রে জামাই-আদরে সেখানেই আছে।

বোধিসত্ত্ব ভাবলেন: কটাহক বড় অন্যায় কাজ করেছে; আমি গিয়ে তাকে ফিরিয়ে আনছি।

এই ভেবে বোধিসত্ত্ব লোকজন নিয়ে তৈরি হ'লেন তাঁর পূর্বোক্ত বন্ধুর বাড়ি যাবার জন্যে। খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। যথাসময়ে কটাহকও সেই খবর শুনতে পেল। কটাহক বুঝতে পারল, তার সংবাদ পেয়েই তার প্রভু আসছেন—নতুবা তাঁর আসবার অন্য কোন কারণ থাকতে পারে না। এখন সে কি করবে? যদি পালিয়ে যায়—তবে আর ফিরে আসবার উপায় থাকবে না। তাই, অনেক ভেবে চিন্তে সে স্থির করল: প্রভুর নিকট সব কথা খুলে বলে তাঁর দাসের মতই সেবা করবে।

কিন্তু তাকে দাসের মত সেবা করতে দেখে লোকে যদি কিছু ভাবে!—এই ভেবে তার উপায় আগেই ক'রে রাখল! সে লোকদের বলে বেড়াতে লাগল:

'প্রত্যেক সন্তানেরই মাতাপিতার সেবা করা কর্তব্য—মাতাপিতার সেবায় দাসের সঙ্গে পুত্রের কোন পার্থক্য থাকাই উচিত নহে।'

এইভাবে জনসাধারণকে উপদেশ দিয়ে সে তার শ্বশুরকে গিয়ে বলল:

'আমার পিতা আসছেন—সুতরাং আমারই উচিত তাঁকে সংবর্ধনা ক'রে নিয়ে আসা।'

শ্রেষ্ঠী কটাহকের কথায় খুশী হয়ে তার সঙ্গে প্রচুর উপহার পাঠিয়ে দিলেন। কটাহকও জিনিসপত্র নিয়ে এগিয়ে গিয়ে তার প্রভুকে প্রণাম ক'রে উপহার সামগ্রী তাঁকে প্রদান করল।

বোধিসত্ত্ব পুরীতে প্রবেশ ক'রে তাঁবু খাটালেন! কটাহক তাঁর সঙ্গে সঙ্গে

থেকে দাসের মতই সেবা করতে লাগল। কটাহকের সেবা দেখে বোধিসত্ত্ব খুব খুশী হ'লেন—এই অবসরে কটাহক তাঁকে অনুরোধ করল:

'প্রভু, দয়া ক'রে আমার প্রকৃত পরিচয় দিয়ে এখানে আমার যা' খ্যাতি-প্রতিপত্তি আছে, তা' নষ্ট করবেন না।'



বোধিসত্ত্ব তাকে আশ্বাস দিলেন যে, এ বিষয়ে কাউকে কিছু বলবেন না।

একদিন বোধিসত্ত্ব কটাহকের স্ত্রীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন: 'কটাহকের আচার-ব্যবহারে কোন খুঁত নেই তো?'

তার স্ত্রী বলল: 'তার চরিত্রে কোন দোষ নেই—শুধু খাওয়া-পরা নিয়েই যা' কিছু গণ্ডগোল।'

তখন বোধিসত্ত্ব তাকে একটি ছড়া শিখিয়ে দিয়ে বললেন ঃ

'সে খেতে বসলে এই মন্ত্রটি বলবে তাহ'লে আর কোন গণ্ডগোল থাকবে না।'

বোধিসত্ত্ব চলে গেলে পর যখন কটাহক খেতে বসেছে, তখন তার স্ত্রী মন্ত্রটি বলল ঃ

'পরবাসীর দেমাক বেশি ভাল কভু নয়,
প্রভু পুনঃ আসবে যবে দেখবে কি যে হয়।
এত বেশি বাড়াবাড়ি তোমার নাহি সাজে,
খেয়ে যাও কটাহক আপনার কাজে।'

কটাহক বুঝতে পারল ঃ বোধিসত্ত্ব তার পরিচয় প্রকারান্তরে জানিয়ে দিয়ে গেছেন। তখন থেকে তার খুঁতখুঁতিও সব দূর হ'য়ে গেল।

কচ্চানি জাতক





যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে, সে জন্মে নিজ কর্মফলে বোধিসত্ত্ব স্বর্গরাজ ইন্দ্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। তখন বারাণসীর রাজা ছিলেন ব্রহ্মদত্ত। কোন বিশিষ্ট বংশের একটি যুবকের তখন পিতৃবিয়োগ হয়। পিতার মৃত্যুর পর সেই যুবকটি তার মাকেই দেবতাজ্ঞান ক'রে সেবা-শুশ্রূষা করত। দিনের সর্বক্ষণই সে মাতার জন্যে কিছু না কিছু কাজ করত।

এদিকে মা দেখলেন—ছেলের বয়স হয়েছে, এখন বিয়ে ক'রে তার গৃহ-ধর্ম পালন করা উচিত। তাই

ছেলেকে ডেকে বললেন : 'বাছা, সমকুল থেকে একটি কন্যা গ্রহণ ক'রে তুমি গৃহস্থের ধর্ম পালন কর। তখন বধূ আমার সেবা করবে, তুমি কাজ করবার অবসর পাবে।'

কিন্তু যুবকের মনে ভয়—বিয়ে করলে সে আর সর্বক্ষণ মাতৃসেবা করতে পারবে না। এই ভয়ে সে বলল, 'না মা, আমার গৃহবাসে আসক্তি নেই। যতদিন তুমি বেঁচে আছ, তোমার সেবা করব, তারপর তোমার মৃত্যু হ'লে আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করব। আমাকে তুমি বিয়ে করতে বল না।'

কিন্তু তার মা তার কথায় কান না দিয়ে এক পাত্রী স্থির করলেন। মায়ের আদেশ লঙ্ঘন করতে না পেরে যুবক বিয়ে করল, কিন্তু সে মন-মরা হয়ে রইল।

এদিকে বিয়ের পর বৌ এসেছে। সে দেখতে পেল তার স্বামী সর্বক্ষণই মাতৃসেবা করছেন। তখন বৌটি ভাবল :

আমিও যদি শাশুড়ীর সেবা করি, তাহ'লে নিশ্চয়ই স্বামী সন্তুষ্ট হবেন।

এই ভেবে বৌটিও শাশুড়ীর সেবা-যত্ন করতে লাগল। যুবকটি এই ব্যাপার দেখে খুবই সন্তুষ্ট হল। সে খুশী হ'য়ে স্ত্রীকে নানারকম ভালো ভালো খাদ্য এবং উপহার এনে দিতে লাগল। তখন আবার বৌটি ভাবল :

স্বামী তো ভালো ভালো জিনিস এনে শুধু আমাকেই দেন, তাঁর মাকে কিছুই দেন না। তাহ'লে নিশ্চয়ই তিনি মাকে তাড়িয়ে দিতে চান।

এই ভেবে সে স্বামীর নিকট শাশুড়ীর নামে নালিশ করতে লাগল। কিন্তু স্বামী তার কথায় কানই দেন না। তখন বৌটি ভাবল :

ঐ বুড়ীকেই উত্ত্যক্ত ক'রে স্বামীর অপ্রীতিভাজন ক'রে তুলব।

তারপর থেকে সে শাশুড়ীর সেবা তো করতই না, উপরন্তু নানাভাবে শাশুড়ীকে নাকাল করতে চেষ্টা করত। কোনদিন হয়তো তরকারীতে লবণ

দিত না, কোনদিন হয়তো বেশি দিত। শাশুড়ী যদি বলতেন—লবণ কম হয়েছে, তবে বৌটি এক মুঠা লবণ এনে মিশিয়ে দিত। ফলে লবণ অনেক বেশি হয়ে যেত। শাশুড়ী বলতেন—'লবণ বেশি হ'য়ে গেছে।'

তখন বৌটি পাড়াপড়শীদের ডেকে বলত :

'তোমরা দেখ আমার শাশুড়ীর কেমন মাথা খারাপ হয়েছে, একবার বলছেন লবণ কম হয়েছে, একবার বলছেন, বেশি হয়েছে। এখন আমি কি করি তোমরাই বল ?'

এমনিভাবে রোজ রোজ নানাভাবে বৌটি শাশুড়ীকে উত্ত্যক্ত করতে লাগল। তাছাড়া ঘর-দোরও অত্যন্ত নোংরা ক'রে রাখত সে। তার স্বামী এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে বলত :

'তোমার মা এ সমস্ত করেছেন। আমি আর ওঁর সঙ্গে বাস করতে পারব না। হয় আমাকে রাখ, নয়তো তোমার মাকে রাখ—আমাদের দু'জনের একসঙ্গে থাকা হবে না।'

রোজ রোজ মায়ের বিরুদ্ধে নালিশ শুনে যুবকটি ভাবল তার মায়েরই বুঝি দোষ। তাই মাকে তাড়িয়ে দিল। তার মা অন্য এক আত্মীয়ের বাড়িতে দাসীবৃত্তি ক'রে দিন কাটাতে লাগলেন।

এদিকে কিছুদিন পর বৌটির এক ছেলে হল। তখন সে পাড়াশুদ্ধ বলে বেড়াতে লাগল যে, বুড়ীটা ছিল এক ডাইনী ; তার জন্যে এতদিন কোন ছেলে-মেয়ে হয়নি ; বুড়ী বাড়ি ছাড়তেই তার ছেলে হল।

তার শাশুড়ী শুনলেন যে তাঁর নাতি হয়েছে। তখনই তিনি ভাবলেন : আমাকে মেরে তাড়িয়ে দিয়ে আমার পুত্র সন্তান পেল—তবে কি ধর্মের মরণ হয়েছে ?

এই ভেবে তিনি স্থির করলেন ধর্মের পিণ্ডি দেবেন। তারপর কিছু তিলবাটা,

চাল, একটা হাঁড়ি ও হাতা নিয়ে শ্মশানে গেলেন এবং তিনটা মড়ার মাথার খুলি নিয়ে পিণ্ডি রাঁধতে বসলেন।

এদিকে স্বর্গ থেকে বোধিসত্ত্ব দেখলেন—ধর্মের মৃত্যু হয়েছে ভেবে বুড়ী তাকে পিণ্ডদান করতে বসেছে। তখন তিনি এক ব্রাহ্মণের বেশে শ্মশানের কাছে গিয়ে বুড়ীকে জিজ্ঞেস করলেন:

'এ শ্মশানে তো কেউ পাক করে না—তুমি তিলান্ন পাক করছ কেন?'

তখন বুড়ী তার দুঃখের কথা খুলে বলল আর জানাল যে, ধর্মের মৃত্যু হয়েছে ভেবেই সে তার পিণ্ড পাক করছে।

তখন বোধিসত্ত্ব আত্মপরিচয় দিয়ে বললেন:

'আমিই ধর্ম। ধর্মের বল দেখাচ্ছি, যে পুত্র তোমায় প্রহার করেছিল, সে নিজের পুত্র-সহ এখনি ভস্ম হ'য়ে যাবে।'

কিন্তু বুড়ী তো নাতির কিংবা পুত্রের মৃত্যু কামনা করে না। সে বোধিসত্ত্বের নিকট প্রার্থনা করল:

'ধর্মরাজ, তুমি যদি খুশী হয়েছ, তবে তাদের শাস্তি না দিয়ে তাদের সঙ্গে আমায় মিলে-মিশে থাকতে দাও।'

বুড়ীর কথায় বোধিসত্ত্ব সত্যি খুশী হয়েছিলেন। তিনি বুড়ীর প্রার্থনা পূরণ করলেন।

বুড়ীর পুত্র নিজের ভুল বুঝতে পেরে স্ত্রী ও পুত্রসহ এসে অপরাধ স্বীকার ক'রে আবার মাকে বাড়িতে নিয়ে গেল। বুড়ীও তার পুত্র, পুত্রবধূ আর নাতিকে নিয়ে সুখে বাস করতে লাগল।

ভিস্স-জাতক



পূর্বজন্মে বোধিসত্ত্ব বারাণসীর এক বিরাট অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁর নাম হয় মহাকাঞ্চনকুমার। তিনি যখন ছেলেমানুষ, তখন তাঁর একটি ভাই হল—তার নাম উপকাঞ্চনকুমার। পর পর তাদের আরো পাচটি ভাই হল, এবং সর্বশেষ হল এক ভগ্নী—তার নাম কাঞ্চনকুমারী।

মহাকাঞ্চনকুমারের যখন পড়াশুনার বয়স হয়েছে, তখন তাঁকে পাঠানো হল তক্ষশিলায়। সেখানে দীর্ঘকাল লেখাপড়া ক'রে মহাকাঞ্চনকুমার সর্ববিদ্যাবিশারদ হয়ে ফিরে এলেন। তখন তাঁর পিতামাতা বললেন :

'লেখাপড়া তো করলে, এবার বিয়ে ক'রে গৃহধর্ম পালন কর।'

বোধিসত্ত্বের কিন্তু বিয়েতে মন নেই—তিনি বললেন :

'পিতা, গৃহধর্মে আমার ইচ্ছা নেই। আপনি অন্য পুত্রদের বিবাহের আদেশ দিন।'

পিতামাতা অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু বোধিসত্ত্ব কিছুতেই বিয়ে করতে রাজী হলেন না। তখন তাঁর বন্ধু-বান্ধবেরা অনেক বোঝালেন, কিন্তু সব কিছুই ব্যর্থ হল। বোধিসত্ত্ব তাঁর মনের ইচ্ছা বন্ধুদের কাছে খুলে বললেন। তাঁর ইচ্ছা—তিনি গৃহত্যাগ করবেন।

তখন পিতামাতা বোধিসত্ত্বের আশা ছেড়ে দিয়ে অন্য পুত্রদের বিয়ে ক'রে সংসার-ধর্ম পালন করতে বললেন কিন্তু কেউ বিয়ে করতে রাজী হল না। এমন কি কাঞ্চনকুমারী পর্যন্ত বিয়েতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন।

কিছুদিন পর ব্রাহ্মণের মৃত্যু হল। মহাকাঞ্চনকুমার তাঁর শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন ক'রে তাঁর সমস্ত ধনরত্ন দরিদ্রদের মধ্যে দান করলেন। তারপর তাঁর ছয় ভাই, ভগ্নী, দু'জন দাসদাসী ও এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে হিমালয়ে চলে গেলেন। সেখানে তাঁরা এক সরোবরের তীরে আশ্রয় নির্মাণ ক'রে ফলমূল আহার ক'রে জীবনযাপন করতে লাগলেন। তাঁরা এক একজন এক একদিকে বেরিয়ে যেতেন এবং নতুন কিছু কেউ দেখতে পেলেই সবাইকে ডেকে নিয়ে তা' দেখাতেন এবং তা' নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন, ফলে আশ্রমকেও মনে হত যেন এটা সাধারণ মানুষের কোন কর্মস্থান।

একদিন মহাকাঞ্চন ভাবলেন : আমরা যথাসর্বস্ব দান ক'রে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছি—কিন্তু তবু লোভ ত্যাগ করতে পারছি না কেন? সবাই মিলে কেবল খাদ্যের সন্ধানে ঘুরছি। এখন থেকে ওরা সবাই আশ্রমে থেকে সন্ন্যাস-ধর্ম পালন করবে, আর আমি সবার জন্যে ফল আহরণ করব।

সন্ধ্যার পর তিনি সবাইকে ডেকে তাঁর মনের কথা খুলে বললেন। তখন তারা তাঁর প্রস্তাবে আপত্তি ক'রে বলল, 'আপনি, ভগ্নী আর দাসীকে নিয়ে

আশ্রমে থাকুন—আমরা এক একদিন এক একজন পালা ক'রে ফল আহরণ করব।'

মহাকাঞ্চনকুমার ভাইদের প্রস্তাবে সম্মত হলেন। সেই থেকে তাঁর ভাইরা পালা ক'রে ফল নিয়ে এসে এক জায়গায় রেখে তা' ভাগ করত, তারপর নিজের ভাগ নিয়ে একটা ঘণ্টা বাজাত। সেই ঘণ্টা শুনে অপরেরা এসে যার যার ভাগ নিয়ে যেত। একের সঙ্গে অপরের আর দেখা-সাক্ষাৎ ঘটত না।

এইভাবে কিছুদিন গেলে পর তাঁরা শুধু পদ্মের মৃণাল মাত্র আহার করতে লাগলেন। তাঁদের তপস্যার জোর দেখে স্বর্গের দেবরাজ ইন্দ্র পর্যন্ত ভীত হ'য়ে উঠলেন।

তিনি তখন এরা সত্যিই সাধক কি না পরীক্ষা ক'রে দেখবেন মনস্থ করলেন।

এই ভেবে পর পর তিনদিন তিনি মহাকাঞ্চনের ভাগ লুকিয়ে রাখলেন। মহাকাঞ্চন প্রথমদিন নিজের ভাগ দেখতে না পেয়ে ভাবলেন: বোধ হয় ভুলে তাঁর ভাগ রাখা হয়নি। দ্বিতীয় দিন ভাবলেন: বোধ হয় আমি কোন অপরাধ করেছি, যার জন্যে ভাইরা আমার ভাগ রাখেনি।

তৃতীয় দিনও যখন নিজের ভাগ পেলেন না, তখন ভাবলেন: যদি কোন অপরাধই ক'রে থাকি, তবে তো ভাইদের নিকট আমার ক্ষমা চাওয়া কর্তব্য।

এই ভেবে তিনি ঘণ্টা বাজালেন। তখন একে একে আশ্রমের সবাই তাঁর নিকট এসে উপস্থিত হ'লে তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন:

'গত তিন দিন যারা ফল এনেছিলে, তারা কি আমার জন্যে কোন ভাগ রেখেছিলে?'

তিনজনই উত্তর করল যে প্রথমেই তাঁর জন্যে ভাগ রেখে, তবে অন্যদের জন্যে ভাগ করেছে।

তখন মহাকাঞ্চনকুমার বললেন : 'আমি তিন দিন আমার ভাগের মৃণাল পাইনি। আমার অবশ্য তাতে কোন লোভ নেই। কিন্তু আমাদের মধ্যে যদি কেউ এই সাধারণ বস্তুর লোভ ত্যাগ করতে না পেরে চুরি ক'রে থাকে, তবে তার সন্ন্যাস গ্রহণই ব্যর্থ।'

মহাকাঞ্চনকুমারের কথা শুনে সবাই 'ছিঃ ছিঃ' ক'রে উঠল।

তখন তাদের দ্বিতীয় ভ্রাতা উঠে দাঁড়িয়ে বলল : 'যে আপনার মৃণাল নিয়েছে, সে যেন বিবিধ ধন-রত্ন, পশু এবং স্ত্রী-পুত্রাদি নিয়ে গৃহধর্ম পালন করে।'

তার শপথ শুনে সবাই বলে উঠল : 'কি সাংঘাতিক শপথ!'

বোধিসত্ত্বও বললেন : 'বৎস! তুমি যে সাংঘাতিক শপথ করেছ, তাতে আমার স্থির বিশ্বাস হয়েছে যে তুমি মৃণাল নাওনি।'

তখন তৃতীয় ভ্রাতা উঠে বলল : 'যে আপনার মৃণাল নিয়েছে, সে যেন মাল্য-চন্দন এবং শত শত পুত্র ভোগ করে ; তার বিষয়-বাসনা যেন তীব্র হয়।'

এর পর উঠল চতুর্থ ভ্রাতা। সে বলল : 'যে আপনার মৃণাল নিয়েছে, তার গৃহ ধনধান্যে পূর্ণ হোক্, সে চিরকাল গৃহে বাস করুক।'

পরে পঞ্চম ভ্রাতা বলল : 'যে আপনার মৃণাল নিয়েছে, সে যেন রাজাধিরাজ হয়ে পৃথিবী শাসন করে।'

পঞ্চম ভ্রাতার পর ষষ্ঠ ভ্রাতা বলল : 'যে আপনার মৃণাল নিয়েছে, সে যেন গণক-ব্রাহ্মণ হয় এবং রাজামহারাজার পূজা পায়।'

অতঃপর সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা বলল : 'যে আপনার মৃণাল নিয়েছে, সে যেন বেদবিদ্ হ'য়ে দেশবাসীর পূজা পায়।'

ভ্রাতাদের শপথ গ্রহণ শেষ হ'লে পর বন্ধু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন : 'যে তোমার মৃণাল নিয়েছে, সে যেন সম্পদসহ বাসবদত্ত গ্রামের অধিপতি হয় এবং মৃত্যু পর্যন্ত যেন তার আসক্তি বর্তমান থাকে।'

অতঃপর উঠল তাদের দাস। সে বলল: 'যে আপনার মৃণাল নিয়েছে, সে গ্রামবাসী হ'য়ে সুখভোগ করুক এবং রাজার অনুগ্রহভাজন হোক্।'

তারপর উঠলেন কাঞ্চনকুমারী। তিনি বললেন: 'যে নারী আপনার মৃণাল নিয়েছে, সে যেন রাজার ষোলহাজার রমণী মধ্যে প্রধানা হয়।'

শেষে উঠলো দাসী। সেও বলল: 'যে নারী আপনার মৃণাল নিয়েছে, সে পাপিষ্ঠা যেন একান্ত স্বার্থপর হয়, আর নিজের গুণকীর্ত্তন করে।'

সবার শপথগ্রহণ শেষ হ'লে মহাকাঞ্চনও বললেন: 'নিজের আহার নষ্ট না হ'লেও যে তাকে নষ্ট হয়েছে বলে রটায়, তার যেন আজীবন বিষয়-আসক্তি থাকে, এবং গৃহবাস যেন তার মৃত্যু হয়।'

ইন্দ্র তাদের কথা শুনে বুঝলেন—এরা প্রকৃতই বাসনাত্যাগী। কিন্তু কিসের বলে তাদের সুখভোগে উপেক্ষা জন্মেছে, তা' জানবার জন্যে তিনি তাদের সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন: 'আপনারা ভোগ্য বস্তুর নিন্দা করছেন কেন?'

তখন তাঁরা উত্তর করলেন: 'পাপেই পাপের বৃদ্ধি হয়। তাই সন্ন্যাসীরা কখনও কামনার প্রশ্রয় দেন না।'

তাঁদের কথা শুনে ইন্দ্র ভয় পেয়ে নিজের দোষ স্বীকার ক'রে ক্ষমা চাইলেন এবং পরে স্বর্গে চলে গেলেন।



মহারাজ শিবি যখন অরিষ্টপুরে রাজত্ব করতেন সেই সময় বোধিসত্ত্ব তাঁর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁর নাম হয় শিবিকুমার।

যথাকালে শিবিকুমার তক্ষশিলা গমন করেন এবং দীর্ঘকাল তথায় অবস্থান ক'রে সর্ববিদ্যাবিশারদ হ'য়ে গৃহে ফিরে আসেন। শিবিরাজ তাঁকে যুবরাজরূপে বরণ করলেন। তারপর কালক্রমে শিবি মহারাজের মৃত্যু হ'লে শিবিকুমার রাজা হ'য়ে দ্বেষ, মোহ, ভয়াদি পরিত্যাগ ক'রে দান, ত্যাগ, অক্রোধ-আদি দশবিধ রাজধর্ম প্রতিপালন ক'রে রাজত্ব করতে লাগলেন।

নগরের চারি দরজায় চারটি, মধ্যে একটি ও রাজপ্রাসাদের দ্বারে একটি দানশালা নির্মাণ ক'রে তিনি দৈনিক ছয় লক্ষ মুদ্রা বিতরণ করতেন এবং তিথি বিশেষে নিজে সেই দানকার্য দেখাশোনা করতেন।

এক পূর্ণিমা তিথিতে শিবিকুমার রাজাসনে বসে ভাবছেন: অনেক দানই তো করলাম, কিন্তু এর সব-কিছুই তো বাইরের। আমার ইচ্ছা হয়, নিজের বলতে যা' আছে, সব-কিছুই দান করি। কেউ যদি আমার হৃদয়ের মাংস চায়, তবে আমি শেল দ্বারা বুক ভেঙ্গে হৃৎপিণ্ড তুলে দিই তাকে। কেউ যদি আমার রক্ত খেতে চায়, তবে তার মুখ ভরে আমার তপ্ত রক্ত বার ক'রে দিই। কেউ যদি মাংস চায়, তবে কাঠুরে যেভাবে কুড়াল দিয়ে কাঠ কাটে, সেই ভাবে বাটাল দিয়ে আমার শরীর থেকে মাংস কেটে বার করি। কেউ যদি আমায় দাসরূপে পেতে চায়, তবে আমি মনের সাধে দেহপাত ক'রেও তার দাসত্ব করি। আর কেউ যদি আমার চোখ দুটো চায়, তবে লোকে যেমন তালশাঁস বার করে, সেই ভাবে আমি কোটর থেকে চোখ দুটো তুলে দিই!

রাজা নিজের মনে যখন এ সমস্ত কথা ভাবছেন, নিজের অনুভূতির বলে তখন ইন্দ্র তা' জানতে পারলেন। তিনি ভাবলেন: শিবিকুমার মনে মনে চোখ দুটো দান ক'রে ফেলবার জন্যে খুবই উৎসুক হ'য়ে উঠেছেন—পরীক্ষা ক'রে দেখি, সত্যি-সত্যি তিনি তা' পারেন কিনা।

এই ভেবে ইন্দ্র বৃদ্ধ অন্ধ ব্রাহ্মণের বেশে রাজার দানশালার পথে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর রাজা যখন হাতীর পিঠে চড়ে দানশালার কাজ দেখতে যাচ্ছেন, তখন ঐ ব্রাহ্মণ-বেশী ইন্দ্র হাত তুলে রাজাকে আশীর্বাদ করলেন। রাজা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন:

'আপনার কি প্রার্থনা ব্রাহ্মণ?'

তখন ব্রাহ্মণ বললেন: 'অনেক দূর দেশ থেকে আমি এসেছি। তোমার

তো দু'টি চক্ষু আছে—তার একটি আমায় দান কর। তোমারও একটা থাকবে, আমারও একটা হবে।'

ব্রাহ্মণের কথা শুনে শিবিকুমার ভাবলেন: কি ভাগ্য আমার! আজই আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'তে চলেছে!

তিনি তখন খুশী হ'য়ে ব্রাহ্মণের দিকে তাকিয়ে বললেন: 'আপনি একটি মাত্র চোখ চাইছেন, আমি আপনাকে দু'টি চোখই দান করব।'

এই বলে তিনি অন্তঃপুরে গিয়ে রাজাসনে উপবেশন করলেন এবং সীবক নামক বৈদ্যকে ডাকিয়ে এনে বললেন: 'আমার চোখ দু'টো তুলে ফেলুন!'

নগরবাসিগণ এই সংবাদ শুনে ছুটে এসে রাজাকে এরূপ কাজ করতে নিষেধ করল। কিন্তু তাদের কথায় রাজা কান দিলেন না। তিনি বললেন: 'একবার যখন চোখ দান করব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, তখন সেই প্রতিশ্রুতি পালন করবই।'

অমাত্যেরা জিজ্ঞেস করলেন: 'আপনি কোন্ কামনায় চক্ষু দান করছেন, মহারাজ?'

শিবিকুমার উত্তর দিলেন: 'কোন কিছুর কামনায় নয়, দানই সাধুদের চিরন্তন ধর্ম, সেই ধর্মবশেই আমি দান করব।'

অমাত্যরা নিরুত্তর হ'য়ে গেলে রাজা বৈদ্যকে বললেন: 'এবার আপনি আমার চোখ দু'টি তুলে ফেলে আমার বন্ধুর কাজ করুন।'

সীবকও রাজাকে বাধা দিতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু কোন ফলই হল না। তখন সীবক ভাবলেন: আমি রাজবৈদ্য। অন্য সাধারণ বৈদ্যের মত অস্ত্র দিয়ে চক্ষু উৎপাটন করা আমার উচিত নহে।

এই ভেবে একটা নীলপদ্মের উপর নানাবিধ ঔষধচূর্ণ ছড়িয়ে দিয়ে তা' রাজার

চোখের উপর বুলাতে লাগলেন। অমনি রাজার চোখের গোলক ঘুরে গেল। তখন সীবক আবার বললেন: 'এখনও ভেবে দেখুন মহারাজ! এখনও আমি এর প্রতিকার করতে পারি।'

রাজা বিরক্ত হয়ে বললেন: 'যা' বলেছি, তাই কর।'

সীবক তখন তিনবার ঔষধচূর্ণ-ছড়ানো সেই পদ্ম রাজার চোখের উপর বুলাতেই সেই চক্ষু-গোলক কোটর থেকে বেরিয়ে এল। তখন সীবক স্নায়ুসূত্র ছিন্ন ক'রে তা' ব্রাহ্মণের কোটরে বসিয়ে দিলেন। ব্রাহ্মণের কোটরে দু'টি চক্ষুই বসে গেল এবং তা' নীলপদ্মের ন্যায় শোভা পেতে লাগল। ইন্দ্র আনন্দিত মনে রাজভবন ত্যাগ ক'রে গেলেন।

অল্পদিন পরেই আপনা থেকে রাজার অক্ষিকোটর পূর্ণ হতে লাগল; কিন্তু তাতে রাজা আর দৃষ্টি ফিরে পেলেন না—তাঁর যন্ত্রণা দূর হল মাত্র।

তখন রাজা চিন্তা করলেন: যে ব্যক্তি অন্ধ, তার রাজ্যে প্রয়োজন কি? আমি অমাত্যদের হাতে রাজ্য সমর্পণ ক'রে উদ্যানে গিয়ে সন্ন্যাস অবলম্বন ক'রে থাকব।

এই ভেবে তিনি অমাত্যদের কাছে তাঁর মনের কথা বললেন।

পরে একজন মাত্র লোক সঙ্গে নিয়ে রাজা প্রাসাদ থেকে দূরে এক পুষ্করিণী-তটে আশ্রম নির্মাণ ক'রে তথায় বাস করতে লাগলেন।

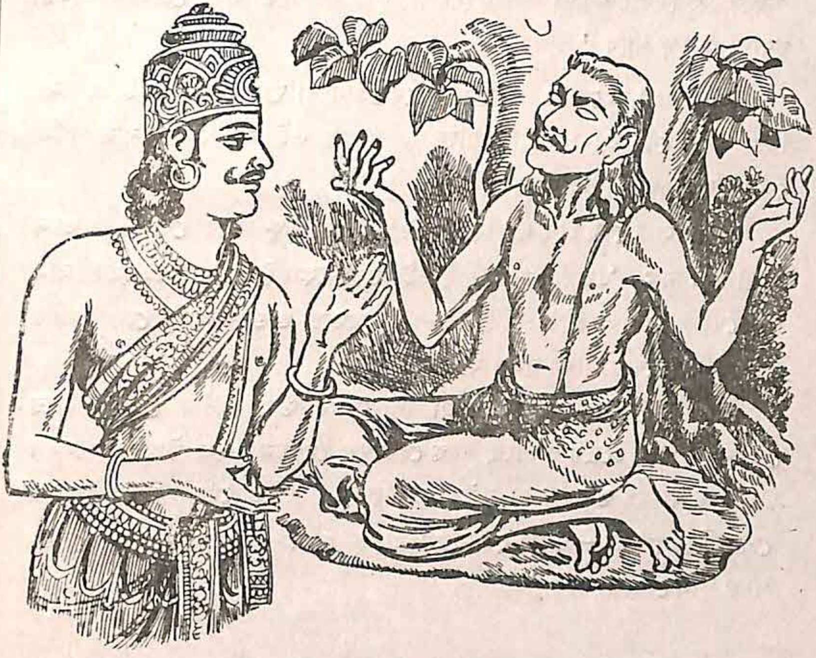
একদিন রাজা তাঁর আশ্রমে বসে যখন নিজের দানের কথা ভাবছেন, তখন ইন্দ্র তাঁর মনের কথা বুঝতে পেরে ভাবলেন:

রাজাকে বর দিয়ে তাঁর চক্ষু দু'টি পূর্বের মত ক'রে দিয়ে আসবেন।

এই ভেবে ইন্দ্র চলে এলেন রাজার আশ্রমের পাশে। তারপর সেখানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। পায়ের শব্দ শুনে রাজা জিজ্ঞেস করলেন: 'কে?'

তখন ইন্দ্র নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন:

'আমি দেবরাজ ইন্দ্র—তোমার প্রতি আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। কি বর চাও বল, তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করব।'



'তা' ছাড়া আমার মনে কোন বিষয়-বাসনাও স্থান পায় না।'

ইন্দ্রের কথায় রাজা বললেন: 'ধন-সম্পদ আমার প্রচুর আছে। তা' ছাড়া আমার মনে কোন বিষয়-বাসনাও স্থান পায় না। অন্ধ হ'য়ে আছি, এখন আমার মৃত্যুই ভাল। বর যদি দিতে হয় তবে আমাকে মরণ-বর দিন।'

ইন্দ্র তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন:

'তুমি অন্ধ বলেই মৃত্যু কামনা করছ কি?'

রাজা ইন্দ্রের কথায় সায় দিলে ইন্দ্র বললেন: 'আমি দেবরাজ হ'লেও অন্ধকে চক্ষু দেবার ক্ষমতা আমার নেই। তুমি সত্যক্রিয়া কর, তোমার নিজের পুণ্যফলেই চক্ষু পাবে।'

তখন রাজা বললেন: 'উচ্চ-নীচ যে কোন ব্যক্তি আমার নিকট প্রার্থনা নিয়ে আসে, সেই আমার প্রিয় ব্যক্তি। আমার এই সত্যক্রিয়ার বলে আমি যেন আমার চক্ষু আবার ফিরে পাই।'

রাজার কথা শেষ হতে না হতেই তিনি একটি চক্ষু ফিরে পেলেন। তখন রাজা বললেন: 'একটি চোখ চাইতেই ব্রাহ্মণকে দুই চোখ দান করেছিলাম এবং সেই দানে পরম প্রীত হয়েছিলাম—এই সত্যের প্রভাবে আমি যেন দ্বিতীয় চোখও ফিরে পেয়ে জীবন সফল করতে পারি।'

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে রাজা শিবিকুমার তাঁর দ্বিতীয় চোখও ফিরে পেলেন; আর ইন্দ্রের প্রভাবে, সমস্ত দেবগণও সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। ইন্দ্র তখন রাজার স্তুতি বন্দনা ক'রে বর দিলেন। 'সত্যধর্মের প্রভাবে তোমার চোখ ফিরে পেয়েছ—এ চক্ষু তোমার দিব্যচক্ষু হোক—আমার বরে শত যোজন পর্যন্ত তুমি দেখতে পাবে।'



ইল্লীস-জাতক

রাজগৃহের নিকট শর্করা নিগম নামে এক নগরে কৌশিক নামে এক শ্রেষ্ঠী বাস করতেন। কৌশিক আশী কোটি সুবর্ণের অধিকারী হলেও অত্যন্ত কৃপণ ছিলেন। জীবনে কাউকে তিনি কিছু দান করেননি, ফলে এত ধনেও কারো কোন উপকার হত না।

একদিন এই শ্রেষ্ঠী রাজার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। তারপর যখন ফিরে আসছেন তখন পথে দেখতে পেলেন একজন গ্রামবাসী কাঁজি দিয়ে আসকে পিঠে খাচ্ছে। তাকে পিঠে খেতে দেখে শ্রেষ্ঠীরও পিঠে খাবার ইচ্ছে হল। কিন্তু তখন মনে হল, তিনি পিঠে খেতে চাইলে তাঁর বাড়ির লোকেরাও পিঠে খেতে চাইবে এবং তা' হলেই অনেক চাল, ঘি আর গুড় খরচ হয়ে যাবে। তাই তিনি মনের ইচ্ছা মনেই চেপে রাখলেন।

এদিকে শ্রেষ্ঠী দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছেন। তা' দেখে তাঁর স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন: 'তোমার কি কোন অসুখ করেছে?'

শ্রেষ্ঠী বললেন: 'না, আমার কোন অসুখ করেনি।'

—'তবে কি রাজা ক্রুদ্ধ হয়েছেন?'

—'না।'

—'তবে কি ছেলেরা কিংবা দাসদাসীরা কোন অপ্রীতিকর কাজ করেছে?'

—'না, তাও কেউ করেনি।'

—'তবে কি তোমার কিছু খেতে ইচ্ছে হচ্ছে?'

এবার স্ত্রীর প্রশ্নে শ্রেষ্ঠী চুপ ক'রে গেলেন। তাঁর স্ত্রী বুঝতে পারলেন, কিছু খেতেই তাঁর ইচ্ছে হয়েছে—অথচ খরচের ভয়ে প্রকাশ করছেন না। তখন তিনি খুব পীড়াপীড়ি করায় শ্রেষ্ঠী বললেন যে তাঁর আসকে পিঠে খেতে ইচ্ছে হয়েছে। শ্রেষ্ঠীর কথা শুনে তাঁর স্ত্রী হেসে উঠে বললেন:

'এর জন্যে মন খারাপ করছ কেন? এত পিঠে তৈরি ক'রে দেব যে, শর্করা নিগমের সমস্ত লোক খেয়েও তা' শেষ করতে পারবে না।'

স্ত্রীর কথায় কিন্তু শ্রেষ্ঠী খুশী হলেন না। তিনি বললেন: 'নগরের সবাইকে খাইয়ে কি হবে?'

তখন স্ত্রী বললেন: 'বেশ তো, শুধু পাড়ার লোকদের জন্যেই পিঠে তৈরি করি।'

শ্রেষ্ঠী বললেন: 'খুব বুঝি টাকা হয়েছে তোমার?'

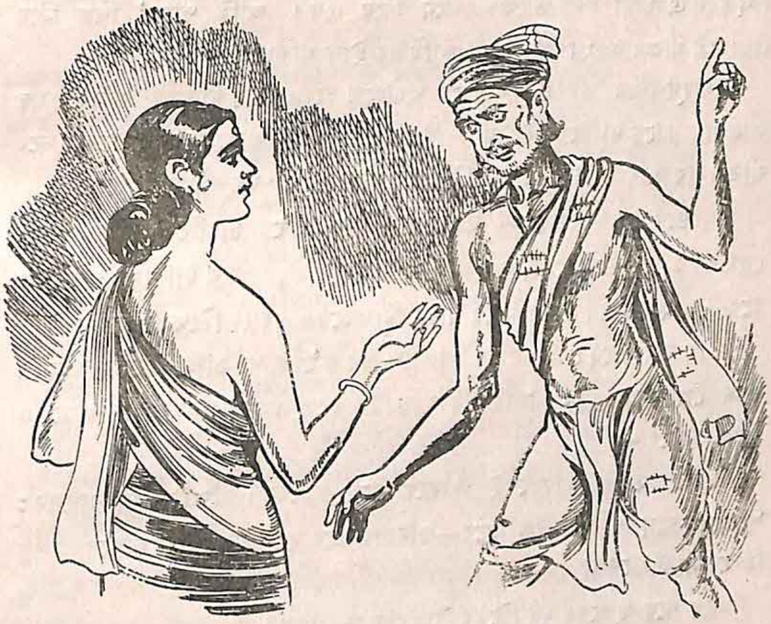
—'তবে তাও দরকার নেই, ছেলেদের জন্যে করি।'

—'ছেলেদের আবার এর মধ্যে টানছ কেন?'

—'আচ্ছা, তবে তোমার আমার জন্যেই পিঠে করি।'

টিপ্পনী কেটে শ্রেষ্ঠী বললেন: 'ও, তোমারও না খেলে চলবে না বুঝি?'

এবার তাঁর স্ত্রী হার মেনে বললেন : 'বেশ, শুধু তোমার জন্যেই পিঠে তৈরি করছি।'



—সাততলার ছাদে গিয়ে পিঠে তৈরি কর—

তখন স্ত্রীকে সাবধান ক'রে দিয়ে শ্রেষ্ঠী বললেন : 'তুমি কিছু খুদ, ঘি আর গুড় নিয়ে সাততলার ছাদে গিয়ে পিঠে তৈরি কর—নইলে সবাই দেখতে পাবে।'

তারপর দু'জনে নীচের তলার সমস্ত দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে ছাদে চলে গেলেন।

এদিকে বোধিসত্ত্ব যোগবলে সমস্ত ব্যাপার জানতে পেরে তাঁর শিষ্য মৌদ্গলায়নকে বললেন: 'তুমি ঐ শ্রেষ্ঠীকে সংযম শিক্ষা দাও এবং তার পিঠের উপকরণ এবং স্ত্রী সহ তাকে এখানে নিয়ে এস। আমি পাচশ' শিষ্য নিয়ে এখানেই থাকব এবং পিঠে দিয়েই আমি সবাইকে খাওয়াব।'

মৌদ্গলায়ন তখনই যোগবলে সুসজ্জিত হয়ে শ্রেষ্ঠীর সাততলা বাড়ির ছাদে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁকে দেখে শ্রেষ্ঠী ভাবলেন: লোকের ভয়ে সাততলায় এসে পিঠে রাঁধছি—কিন্তু শ্রমণটা এখানে পর্যন্ত ধাওয়া করেছে।

আগুনে নুন পড়লে যেমন তা' চটচট শব্দ ক'রে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি ভাব নিয়ে শ্রেষ্ঠী বললেন: 'কি হে শ্রমণ, ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলে কি হবে—আকাশে পথ তৈরি ক'রে পায়চারি করলেও এখানে ভিক্ষে মিলবে না।'

তাঁর কথা শুনে মৌদ্গলায়ন আকাশে পথ ক'রেই পায়চারি করতে লাগলেন। তখন শ্রেষ্ঠী বললেন: 'পায়চারি করলে কি হবে, এখানে পালঙ্কে বসে থাকলেও ভিক্ষে মিলবে না।'

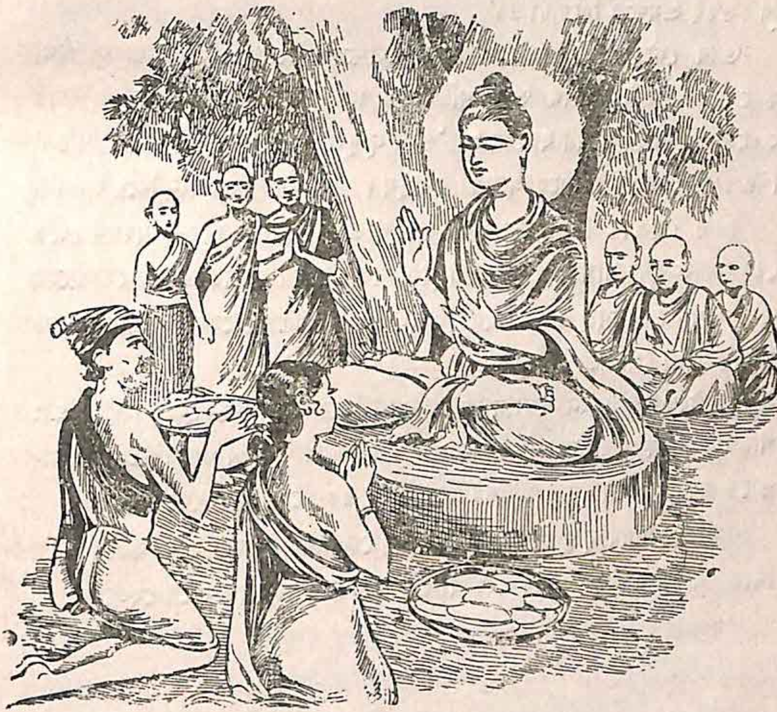
স্থবির তখন আকাশেই পালঙ্কে বসে রইলেন। শ্রেষ্ঠী তখন বললেন: 'পালঙ্কে বসে থাকলে কি হবে—জানলায় এসে মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেও কিছু মিলবে না এখানে।'

সঙ্গে সঙ্গে স্থবিরের মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরুতে লাগল।

'কী জানি যদি বাড়ি পুড়ে যায়!' এই ভয়ে তখন শ্রেষ্ঠী তাঁর স্ত্রীকে বললেন: 'খুব ছোট দেখে একটা পিঠে তৈরি ক'রে ওকে দিয়ে দাও।'

তাঁর স্ত্রী সামান্য একটু পিটুলি কড়ায় ছাড়লেন। কিন্তু দেখতে দেখতে কড়াটার বেশ খানিকটা জায়গা ভরে উঠল পিটুলিতে। শ্রেষ্ঠী ভাবলেন: তাঁর স্ত্রী বুঝি অনেকটা পিটুলি দিয়েছেন। তখন তাঁকে বললেন: 'হাতায় ক'রে একটুখানি পিঠে ক'রে দাও ওকে।'

শ্রেষ্ঠীর পত্নী তাই করলেন, কিন্তু এবার পিঠে আরও বড় হল। এর পর যতবার ছোট পিঠে করতে চেষ্টা করছেন, ততবারই দেখেন পিঠে বড় হয়ে উঠেছে। তখন শ্রেষ্ঠী বললেন:



ভগবান্ বুদ্ধকে পিঠে খেতে দিলেন—পৃষ্ঠা ৪৬

'কি আর করবে—এর মধ্যে থেকেই একখানি পিঠে তুলে দাও।'

কিন্তু শ্রেষ্ঠীপত্নী কোন পিঠেই আলগা করতে পারেন না—সব এক সঙ্গে জুড়ে

যায়। অনেক চেষ্টা ক'রে যখন চুবড়ি থেকে শ্রেষ্ঠীপত্নী পিঠে ছাড়াতে পারলেন না, তখন তাঁরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে টানাটানি করতে লাগলেন। কিন্তু তাতেও কিছু হল না। তখন বাধ্য হয়ে শ্রেষ্ঠী বললেনঃ 'দরকার নেই—চুবড়িশুদ্ধই শ্রমণকে দিয়ে দাও।'

তখন মৌদ্‌গলায়ন শ্রেষ্ঠীকে কিছু ধর্মোপদেশ দিলেন এবং দানের ফল বর্ণনা করলেন। শ্রেষ্ঠীর মনের ভাব পরিবর্তিত হল, তিনি স্থবিরকে বেশ সমাদর করলেন। তখন স্থবির বললেনঃ 'ভগবান্ বুদ্ধদেব পিঠে খাবার জন্যে পাঁচশ' শিষ্য নিয়ে জেতবন বিহারে অপেক্ষা করছেন। তোমাদের সেখানে নিয়ে যাব।'

কিন্তু জেতবন বিহার সেখান থেকে পঁয়তাল্লিশ যোজন দূরে—সেখানে যেতে তো অনেক সময় লাগবে। তখন মৌদ্‌গলায়ন যোগবলে শ্রেষ্ঠীর প্রাসাদ-সোপানের এক মাথা সেখানেই রেখে অপর মাথা জেতবনে নিয়ে গেলেন। কাজেই মুহূর্ত মধ্যেই তাঁরা জেতবনে পৌঁছুলেন।

শ্রেষ্ঠীদম্পতি তখন ভগবান্ বুদ্ধের নিকট গিয়ে তাঁকে পিঠে খেতে দিলেন এবং পাঁচশ' ভিক্ষুকেও পরিতোষ সহকারে ভোজন করালেন। কিন্তু পিঠের পরিমাণ তাতে একটুও কমেনি। অবশিষ্ট পিঠে তখন এক গর্তের মধ্যে ফেলে দিলেন।

অতঃপর ভগবান্ বুদ্ধ শ্রেষ্ঠী ও তাঁর পত্নীকে নানা উপদেশ দান করলে তাঁরা নিজের বাড়িতে ফিরে এলেন এবং আশী কোটি মোহরই দান ক'রে ফেললেন।



কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-জাতক

পুরাকালে বৎসরাজ্যে কৌশাম্বী নামে এক নগর ছিল। ঐ কৌশাম্বী নগরের রাজা ছিলেন কৌশাম্বিক। তাঁর রাজত্বকালে নিগম গ্রামে দু'জন ব্রাহ্মণ ছিলেন—তাঁরা উভয়েই ছিলেন মহাধনী। তাঁদের একজনের নাম দ্বৈপায়ন, অপরজনের নাম মাণ্ডব্য। আবার দু'জনেই ছিলেন পরম বন্ধু। বিষয়-বাসনার দোষ দেখতে পেয়ে দু'জনেই নিজেদের সমস্ত ধন দান ক'রে বাড়ি ছাড়লেন। তারপর হিমালয়ে আশ্রম তৈরি ক'রে তাঁরা ফলমূল কুড়িয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। এইভাবে পঞ্চাশ বছর কেটে গেলেও তাঁরা ধ্যানবল লাভ করতে পারলেন না।

তারপর একদিন তাঁরা লবণ ও টক খাবার ইচ্ছায় ভিক্ষা করতে করতে কাশীরাজ্যে উপস্থিত হলেন। সেখানেও মাণ্ডব্য নামে এক গৃহী থাকতেন। দ্বৈপায়ন আর তপস্বী মাণ্ডব্য সেই গৃহীর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। সেখানেই তাঁরা কুঁড়েঘর তৈরি করলেন এবং বস্ত্র, ভোজ্য, শয্যা আর ঔষধ পেয়ে বসবাস করতে লাগলেন। সেখানে তিন চার বছর বাস করবার পর এক শ্মশানে গিয়ে থাকতে লাগলেন। দ্বৈপায়ন কিছুকাল পর আবার এক গৃহীর নিকট চলে গেলেন, কিন্তু মাণ্ডব্য শ্মশানেই রয়ে গেলেন।

একদিন এক চোর নগরে চুরি ক'রে সমস্ত চোরাই মাল নিয়ে পালাচ্ছে, তখন বাড়ির মালিক টের পেয়ে তাকে তাড়া করলেন। চোর কোন রকমে নগর পার হয়ে সেই শ্মশানে এসে মাণ্ডব্যের কুটিরের সামনে চোরাই মাল ফেলে রেখে পালাল।

চোরের পিছু পিছু সেই গৃহস্বামী আর পাহারাদাররা এসে মাণ্ডব্যের কুটিরের সামনে চোরাই মাল দেখে তাঁকেই চোর বলে ধরে বেঁধে নিয়ে গেল রাজার কাছে। রাজা আর কোন বিচার না করেই তাঁকে শূলে চড়ানোর আদেশ দিলেন।

প্রথমে তাঁকে খয়ের কাঠের শূলে চড়ানো হল, কিন্তু শূল বিঁধল না ; পরে নিম কাঠের শূলে চড়ানো হল, কিন্তু সেই শূলও তাঁর দেহে বিঁধল না।

তখন মাণ্ডব্য পূর্ব জন্মের কথা চিন্তা করতে লাগলেন। তাঁর মনে হল, এক জন্মে আবলুস কাঠের একটা কাঠিতে তিনি একটা মাছিকে বিঁধিয়ে দিয়েছিলেন। সেই জন্মে তিনি ছিলেন এক ছুতোরের ছেলে। কাঠের কুঁচি নিয়ে খেলার ছলে ঐ কাজটি করেছিলেন। তখন তিনি বুঝলেন, পূর্বজন্মের ঐ পাপেই তাঁকে এ জন্মে শূলযন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে—এ পাপের হাত থেকে মুক্তিলাভের কোন উপায় নেই।

তিনি তখন রাজপুরুষদের বললেন : 'আমাকে যদি শূলে দিতে চাও, তবে আবলুস কাঠের শূল নিয়ে এস।'

তারপর তারা মাণ্ডব্যকে আবলুস কাঠের শূলে চড়িয়ে দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

এদিকে দ্বৈপায়ন অনেকদিন মাণ্ডব্যকে দেখতে না পেয়ে তাঁর খোঁজ নিতে বের হলেন। পথে শুনলেন যে তাঁকে শূলে চড়ানো হয়েছে। তখন তিনি মাণ্ডব্যের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন : 'কি অপরাধে তোমার শূলদণ্ড হল ?'

মাণ্ডব্য বললেন : 'আমি ত' কোন অপরাধ করিনি।'

দ্বৈপায়ন জিজ্ঞেস করলেন : 'এজন্য তোমার মনে তো কোন বিদ্বেষের ভাব জন্মেনি ?'

মাণ্ডব্য উত্তর করলেন : 'না ভাই, রাজা কিংবা তাঁর অনুচরদের প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ নেই।'

তখন দ্বৈপায়ন বললেন : 'তোমার মত পুণ্যাত্মার ছায়ায় বসলেও পুণ্য হয়।'

এই বলে দ্বৈপায়ন তাঁর ছায়ায় বসে রইলেন। মাণ্ডব্যের দেহের ফোঁটা ফোঁটা রক্ত দ্বৈপায়নের দেহে পড়ে তা' কালো কালো দাগে পরিণত হল। সেই থেকে দ্বৈপায়নের নাম হল কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।

প্রহরীরা দূর থেকে এই ব্যাপার দেখে রাজাকে খবর দিল। তখন রাজার মনে হল তিনি তো কোন বিচার না করেই ঐ ব্যক্তিকে শূলে দেবার আদেশ দিয়েছেন। তিনি ছুটে গেলেন তাঁদের কাছে। তারপর দ্বৈপায়নকে লক্ষ্য করে বললেন—'প্রভু, আপনি ওখানে বসে আছেন কেন ?'

দ্বৈপায়ন বললেন : 'মহারাজ, আমি এই তপস্বীকে রক্ষা করবার জন্যেই

এখানে বসে আছি। ইনি কি অপরাধ করেছেন, যার জন্যে এঁকে শূলে দিয়েছেন ?'

রাজা তখন স্বীকার করলেন যে প্রকৃত বিচার না করেই তাঁকে শূলে দেবার আদেশ দেওয়া হয়েছে। একথা শুনে দ্বৈপায়ন রাজাকে রাজধর্ম বুঝিয়ে দিলেন।

তারপর মাণ্ডব্যকে শূল থেকে নামিয়ে আনা হল। কিন্তু শূল আর তাঁর দেহ থেকে খোলা গেল না। যে অংশ দেহের বাইরে ছিল সে অংশ কেটে ফেলা হল।

রাজা তপস্বীদের প্রণাম ক'রে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং নিজের উদ্যানেই তাঁদের জন্যে আশ্রম নির্মাণ ক'রে দিয়ে তাঁদের বনবাসের ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করলেন।

পঞ্চায়ুধ জাতক



একবার বোধিসত্ত্ব বারাণসী-রাজ ব্রহ্মদত্তের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। জাতকের নামকরণ-দিবসে রাজা আটশ' ব্রাহ্মণকে ডেকে এনে প্রচুর উপহার দিলেন, এবং জাতকের ভাগ্য কেমন হবে, জানতে চাইলেন।

ব্রাহ্মণগণ জাতকের দেহে সর্ববিধ সুলক্ষণ দেখে বললেন ঃ 'এই কুমার সর্বগুণান্বিত রাজা হবেন। পঞ্চবিধ আয়ুধ বা অস্ত্রের প্রভাবে সমস্ত জম্বুদ্বীপে কেউ আর এঁর সমকক্ষ বলে গণ্য হবেন না।'

ব্রাহ্মণদের মুখে কুমার-সম্বন্ধে এই ভবিষ্যৎ-বাণী শুনে জনক-জননী কুমারের নাম রাখলেন পঞ্চায়ুধ-কুমার।

কুমার বয়ঃপ্রাপ্ত হ'লে একদিন রাজা ব্রহ্মদত্ত পুত্রকে ডেকে বললেন : 'গান্ধার রাজ্যে তক্ষশিলা নগরে এক সুবিখ্যাত আচার্য আছেন। তুমি সহস্র মুদ্রা দক্ষিণা নিয়ে গিয়ে তাঁর কাছে বিদ্যাভ্যাস করে এস।'

পিতার কথায় পঞ্চায়ুধকুমার তক্ষশিলা চলে গেলেন। তারপর কিছুকাল তথায় বিদ্যাভ্যাস ক'রে সর্ববিদ্যানিপুণ হয়ে যখন তিনি বারাণসী ফিরে আসবেন, তখন আচার্য তাঁকে পঞ্চবিধ আয়ুধ দান করলেন। পঞ্চায়ুধকুমার গুরুর আশীর্বাদ এবং পঞ্চবিধ আয়ুধ নিয়ে এক বনপথ দিয়ে বারাণসীর দিকে এগোতে লাগলেন।

ঐ বনে ভীষণ এক যক্ষ বাস করত। পথিকরা পঞ্চায়ুধকুমারকে বারবার সাবধান ক'রে দিল। তারা বলল : 'এই বনে যে যক্ষ বাস করে, সে মানুষ দেখলেই মেরে ফেলে ; কাজেই এই বনপথে এগোবেন না।'

পঞ্চায়ুধ তাদের কথায় ভয় না পেয়ে নিজের শক্তির কথা মনে রেখে সেই বনের মধ্যে প্রবেশ করলেন। দুঃসাহসী মানুষকে একাকী বনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে দেখে ভীষণ মূর্তি ধরে এগিয়ে এল যক্ষ। তার দেহ শালগাছের মত, মাথা চিলেকোঠার মত, চোখ দুটি গামলার মত, উপরের দুটো দাঁত মূলার মত, মুখ বাজ পাখীর মত, হাত-পা নীল এবং উদরের রং বিচিত্র।

এই বেশে পঞ্চায়ুধকুমারের সামনে এসে যক্ষ বলল : 'কোথায় যাচ্ছ, দাঁড়াও, তুমি ত' আমার খাদ্য।'

যক্ষের কথায় পঞ্চায়ুধকুমার ভয় পেলেন না। তিনি বললেন : 'তুমি যক্ষ হতে পার, কিন্তু সাবধানে আমার কাছে এগিয়ো। আমি আমার নিজের বল বুঝেই এই বনে ঢুকেছি। মনে রেখ, আমার যে-কোন একটা তীরের আঘাতেই তোমার মৃত্যু হতে পারে।'

এই বলে কুমার যক্ষের দিকে এক অতি বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু

কি আশ্চর্য—এই তীর যক্ষের দেহ স্পর্শও করল না। তা' যক্ষের দেহের রোমের মধ্যেই আটকে রইল।

কুমার তখন একে একে পঞ্চাশটি তীর নিক্ষেপ করলেন—কিন্তু সব তীরই আগের মত যক্ষের রোমের মধ্যে আটকে রইল। তখন যক্ষ একটা গা ঝাড়া দিল, আর ঝরঝর করে সবগুলি তীর তার দেহ থেকে মাটিতে পড়ে গেল।

এদিকে যক্ষ ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে—কুমারকে সে খাবে। কুমার তাঁর যে-সমস্ত অস্ত্র সম্বল ছিল একে একে সবগুলিরই ব্যবহার করলেন কিন্তু কিছুই হল না। তখন তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন যক্ষের উপর। ডান হাত দিয়ে আঘাত করতে তাঁর ঐ হাত যক্ষের রোমে আটকে রইল। তারপর ক্রমে বাঁ হাত, ডান পা, বাঁ পা এবং শেষ পর্যন্ত মাথা দিয়ে আঘাত করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাত পা মাথা সমস্ত যক্ষের রোমে আটকে গেল। কুমার যক্ষের দেহে ঝুলতে লাগলেন। কিন্তু তখনও তাঁর মনে ভয় জাগেনি।

কুমারের এই অদ্ভুত সাহস দেখে যক্ষও অবাক্ হল। এতদিন ধরে সে মানুষ ধরে ধরে খাচ্ছে, কিন্তু কোন মানুষই তো এতটা সাহস দেখায়নি। যক্ষের নিজের মনেও একটু ভয় হল—সে পঞ্চায়ুধকুমারকে খেতে সাহস করল না, তাঁকে জিজ্ঞেস করল: 'তোমার চিত্তে ভয় নেই কেন? মৃত্যুকেও কি তুমি ভয় কর না?'

নির্ভয় চিত্তে উত্তর দিলেন কুমার: 'মরণকে ভয় করে লাভ কি? জন্ম হ'লেই মরণ হবে—এ তো নিশ্চিত, তবে আর ভয় কেন? আর তুমিও মনে রেখ, আমাকে খেলেও তুমি নিষ্কৃতি পাবে না। আমার উদরে যে বজ্রায়ুধ আছে, তা' হজম করবার ক্ষমতা তোমার নেই। ঐ অস্ত্রগুলি তোমার পেটের নাড়িভুঁড়ি ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে, কাজেই আমার মৃত্যু হলে তোমারও মৃত্যু হবে।'

কুমারের কথা শুনে যক্ষ আরও ভয় পেল। তার মনে হল, কুমারের কথাই

সত্যি। এই ভেবে সে কুমারকে ছেড়ে দিয়ে বলল : 'তোমাকে মুক্তি দিলাম, তুমি দেশে ফিরে যাও!'

তখন কুমার বললেন : 'আমি তো মুক্তি পেলাম, কিন্তু তোমার মুক্তির কি উপায় হবে? এইভাবে যদি জীবন কাটাও তবে কোনো জন্মেই আর মুক্তি পাবে না।'

এই বলে কুমার যক্ষকে দান, দয়া, অহিংসা প্রভৃতি বিষয়ে অনেক উপদেশ দিলেন। যক্ষও ভয় পেয়ে হিংসা ক্রোধ আদি ত্যাগ ক'রে সংযমী হল। অতঃপর সে বনের দেবতারূপে অধিষ্ঠিত হল এবং মানুষের দেওয়া পূজা, উপহারাদি গ্রহণ করতে লাগল।

যক্ষের প্রকৃতি-পরিবর্তন বিষয়ে সবাইকে সংবাদ দিতে দিতে কুমার সানন্দে বারাণসীতে ফিরে এলেন।



মহাকপি-জাতক

বোধিসত্ত্ব একবার বানররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আশী হাজার বানরের দলপতি হয়ে হিমালয় অঞ্চলে থাকতেন। সেখানে গঙ্গাতীরে এক বিরাট আমগাছ ছিল। সেই গাছের ফলগুলি ছিল মধুর এবং অমৃত-তুল্য। গাছটির একটা ডাল গঙ্গার উপর ঝুঁকে ছিল—অন্য ডালগুলির ফল পড়ত ডাঙ্গায় কিংবা গাছের গোড়ায়।

বোধিসত্ত্ব যখন বানরদের নিয়ে গাছের ফল খেতেন, তখনই ভেবেছিলেন ঃ ঐ গাছের ফল জলে পড়লেই আমাদের বিপদ ঘটতে পারে। কাজেই জলের উপর যে ডালটি ছিল, তিনি তাতে কোন ফল রাখতেন না। ফুল ফুটতেই কিংবা কুঁড়ি হতেই সবাই মিলে সেগুলি নষ্ট ক'রে ফেলতেন। একবার কি ক'রে একটি ফল সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে ঐ ডালে রয়ে গেল এবং এক সময় জলে পড়ে গেল।

বারাণসীরাজ ঐ সময়ে জলে জাল পেতে জলখেলা করছিলেন। ফলটা গিয়ে আটকাল ঐ জালে। তারপর যখন জাল গুটানো হল, তখন রাজা জলের মধ্যে ফল দেখতে পেয়ে জেলের কাছে ঐ ফলের নাম জিজ্ঞেস করলেন।

জেলে এর উত্তর দিতে পারল না। তখন বনচরদের খবর দিয়ে নিয়ে আসা হল। তারা বলল যে ঐ ফলের নাম আম। আমটাকে টুকরো টুকরো করে রাজা প্রথম একভাগ বনচরদের খাওয়ালেন, তারপর অন্যান্য ভাগ নিজেরাও খেলেন। ফলের দিব্যরসে রাজা পরম তৃপ্তি লাভ করলেন। তখন বনচরদের জিজ্ঞেস করলেন: 'ঐ ফলের গাছ কোথায় আছে?'

তখন বনচরেরা পথ দেখিয়ে চললো, আর রাজা নৌকা নিয়ে চললেন তাদের পিছনে পিছনে। কতদিন পর তাঁরা গঙ্গাতীরবর্তী সেই আমগাছের নিকট এসে পৌঁছালেন। রাজা তখন নৌবহর দূরে রেখে সদলবলে নৌকা থেকে মাটিতে নামলেন এবং হেঁটে হেঁটে এসে আমগাছের কাছে দাঁড়ালেন। তারপর গাছের নীচেই বিছানা পেতে ওখানে থাকবার বন্দোবস্ত করলেন এবং চারদিকে প্রহরী রেখে আগুন জ্বালিয়ে রাখলেন।

রাজা তাঁর অনুচরদের নিয়ে ঘুমিয়ে পড়বার পর বোধিসত্ত্বও বানরদের সঙ্গে নিয়ে আমগাছে চড়লেন। আশী হাজার বানর ডাল থেকে ডালে ঘুরতে লাগল আর আম খেতে লাগল।

ইতিমধ্যে রাজার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি তাঁর অনুচরদের ডেকে তুলে বললেন: ঐ বানরগুলি যাতে পালাতে না পারে, তার ব্যবস্থা কর, আগামী কাল আমের সঙ্গে বানরের মাংস খাওয়া হবে।'

রাজার আদেশে অনুচরগণ তীর হাতে নিয়ে গাছ বেড় দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এই দেখে বানররা প্রাণভয়ে ভীত হয়ে পালাবার জন্যে চেষ্টা করল, কিন্তু পালানোর আর পথ নেই। তখন তারা গিয়ে বোধিসত্ত্বকে বলল: 'আমরা পালাতে চেষ্টা

করলেই রাজার অনুচরেরা আমাদের তীর মেরে হত্যা করবে, আর পালাতে না পারলেও কাল আমাদের সকলকে বধ করবে। এখন এর একটা উপায় করতে না পারলে, আমাদের মৃত্যু নিশ্চিত।'

বোধিসত্ত্ব তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বললেন : 'তোমাদের কোন ভয় নেই, আমি তোমাদের রক্ষা করব!'

বানরদের এই বলে আশ্বাস দিয়ে বোধিসত্ত্ব, গাছের যে ডালটি গঙ্গার উপর পড়েছে, তাতে চড়ে এক লাফ দিলেন। সেই লাফে নদী পার হয়ে তিনি ওপারে এক ঝোপের উপর পড়লেন। তারপর সেখান থেকে নীচে নেমে তিনি শূন্যে কতদূর লাফিয়ে এসেছেন, তা' অনুমান করে নিলেন। পরে একটা বেতগাছ তুলে তার বাকল ছাড়িয়ে নিয়ে হিসেব করলেন : এতটা গাছে বাঁধা থাকবে, আর এতটা শূন্যে থাকবে।

কিন্তু বেতের যে অংশ তাঁর নিজের কোমরে বাঁধা থাকবে, তার হিসেব নিতে ভুলে গেলেন। তখন নদীতীরের একটা গাছের সঙ্গে বেতের এক মাথা বেঁধে আর এক মাথা বাঁধলেন নিজের কোমরে। তারপর তীরবেগে দিলেন লাফ ; কিন্তু বেতের হিসেব করবার সময় ভুল করেছিলেন বলে লাফ দিয়ে গাছের উপর গিয়ে পড়তে পারলেন না। কেবল দু'হাত দিয়ে গাছের একটা ডাল আঁকড়ে ধরলেন। তারপর তিনি বানরদের বললেন : 'যত শীঘ্র পার, ঐ বেত বেয়ে বেয়ে ওপারে চলে গিয়ে তোমরা নিরাপদ হও।'

তখন সেই আশী হাজার বানর বোধিসত্ত্বকে প্রণাম করে ও তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে তাঁর দেহের উপর দিয়েই নদীর ওপারে গিয়ে পৌছাল। ঐ বানর দলের মধ্যে দেবদত্তও ছিলেন। দেবদত্ত জন্ম জন্মান্তর ধরেই বোধিসত্ত্বের শত্রুতা করে আসছিলেন, এ জন্মেও তাঁর মনে শত্রুতার ভাব বজায় ছিল। এইবার সুযোগ পেয়ে ভাবলেন : শত্রুর উপর প্রতিশোধ নেবার এই তো উপযুক্ত সময়!

এই ভেবে দেবদত্ত গাছের একেবারে মগডাল থেকে লাফ দিয়ে পড়লেন বোধিসত্ত্বের পিঠে। সেই আঘাতে বোধিসত্ত্বের পিঠ ভেঙ্গে গেল। তবু তিনি



'তুমি কে, আর বানররাই বা তোমার কে হয়?'—পৃষ্ঠা ৫৯

দেবদত্তকে ওপারে যাবার সুযোগ দেবার জন্যে গাছের ডাল আঁকড়ে ধরে রইলেন,—দেবদত্ত ওপারে চলে গেলেন।

রাজা কিন্তু জেগে থেকে সমস্ত দেখছিলেন। তিনি অবাক্ হয়ে ভাবলেন: কে এই মহাপুরুষ, যিনি বানর কুলে জন্মগ্রহণ করেও দলের বানরদের প্রাণরক্ষার জন্যে স্বেচ্ছায় নিজের প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছেন।

এই ভেবে রাজা অনুচরদের ডেকে বললেন: 'ঐ বানরকে বধ না করে ধীরে সুস্থে এখানে নিয়ে এসে তার উপযুক্ত সেবাশুশ্রূষা কর।'

তখন রাজার নৌকাগুলি সরিয়ে নিয়ে আসা হল অর্ধগঙ্গায় এবং তার উপর উচ্চ এক মাচা তৈরি করে ধীরে ধীরে বানর-রাজকে নামিয়ে আনা হল। তারপর কাপড় দিয়ে তার দেহ আবৃত করে গঙ্গার জলে স্নান করিয়ে তাকে চিনির সরবৎ খাওয়ানো হল। তার দেহে সহস্রপাক তৈল মাখানো হল, তারপর তাকে শয্যায় শুইয়ে দিয়ে রাজা একটা নিচু আসনে বসে জিজ্ঞেস করলেন: 'নিজের দেহকে সাঁকো করে তুমি বানরদের প্রাণ রক্ষা করেছ। তুমি কে, আর বানররাই বা তোমার কে হয়?'

তখন বানররাজ বললেন: 'আমি এই বানরদের দলপতি।'

তারপর ধীরে ধীরে তিনি কি ভাবে বানরদের প্রাণ রক্ষা করেছেন, সে কথা বললেন রাজাকে। এই কথা শেষ হলে পর বোধিসত্ত্ব রাজাকে ধর্মোপদেশ দিতে দিতে প্রাণত্যাগ করলেন।

তারপর রাজার আদেশে মহা সমারোহে বানররাজের জন্যে চিতা সাজানো হল। মহিলারা রক্তবস্ত্র পরিধান করে এলোচুলে উল্কা হাতে নিয়ে বানররাজের চারদিকে ঘুরলেন। এর পর চিতায় আগুন দেওয়া হল।

অতঃপর বোধিসত্ত্বের চিতার উপর রাজা এক চৈত্য নির্মাণ করিয়ে দিয়ে সেখানে প্রেতপূজা করলেন। বোধিসত্ত্বের কপালাস্থি সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে তা' নিয়ে গেলেন বারাণসীধামে। সমস্ত নগর সাজসজ্জায় অলংকৃত করে সাত দিন সেই অস্থির পূজা করলেন। তারপর এর উপরও এক চৈত্য নির্মাণ

করলেন। রাজা যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন সেই চৈত্যে যথাবিধি পূজা অর্চনা হত এবং রাজাও বোধিসত্ত্বের উপদেশমত দানধর্মাদির অনুষ্ঠান করতেন।

তারপর যথাকালে রাজার মৃত্যু হ'লে, রাজা স্বর্গলোকে গমন করেন।

সমাপ্ত